চায়—তবু যদি তুমি বল আমার হাতের তেলোর মধ্যে সহজকে এনে দাও তবে তুমি আর কিছুকে চাচ্চ।

বস্তুত, যা সহজ, অর্থাৎ যাকে আমরা অনায়াসে দেখচি, অনায়াসে শুনচি, অনায়াসে বুঝচি, তার মত কঠিন আবরণ আর নেই। যিনি গভীর তিনি এই অতি প্রত্যক্ষগোচর সহজের দ্বারাই নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। বহুকালের বহু চেষ্টায় এই সহজ দেখাশোনার আবরণ ভেদ করে'ই মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে, দর্শনের তত্ত্বকে দেখেছে, যা কিছু পাওয়ার মত পাওয়া তাকে লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, কর্ম্মক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনায় আপনার সহজ প্রবৃত্তিকে ভেদ করে' তবে কর্ত্তব্যনীতিতে গিয়ে পৌঁচেছে। মানুষ আপনার সহজ ক্ষুধা তৃষ্ণাকেই বিনা বিচারে মেনে পশুর মত সহজ জীবনকে স্বীকার করে নেয় নি ; এই জন্যেই শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করবার শিক্ষা নিয়ে তাকে দুঃসাধ্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে—বারম্বার পরাস্ত হয়েও সে পরাভব স্বীকার করতে পারচে না। শুধু চরিত্রে এবং কর্ম্মে নয়, হৃদয়ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে। ভালবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা কর্‌চে। এই দুঃসাধ্য সাধনায় সে যতই অকৃতকার্য্য হোক্ এ-কে সে কোনো মতেই অশ্রদ্ধা করতে পারে না ; তাকে বল্‌তেই হবে যদিচ স্বার্থ আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ ও সহজ এবং পরার্থ গূঢ়নিহিত ও দুঃসাধ্য তবু স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্য সাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয় সুতরাং সে গভীরতর আনন্দ পায়, অর্থাৎ এই কঠিন ব্রতই আমাদের গুহাহিত মানুষটির যথার্থ জীবন—কেননা, তার পক্ষে নাল্পে সুখমস্তি।

জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে মানুষের পক্ষে সর্ব্বত্রই যদি এই কথাটি খাটে, জ্ঞানে ভাবে কর্ম্ম সর্ব্বত্রই যদি মানুষ সহজকে অতিক্রম করে' গভীরের দিকে যাত্রা করার দ্বারাই সমস্ত শ্রেয় লাভ করে' থাকে, তবে কেবল কি পরমাত্মার সম্বন্ধেই মানুষ দীনভাবে সহজকে প্রার্থনা করে' আপনার মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করবে ? মানুষ যখন টাকা চায় তখন সে একথা বলে না, টাকাকে ঢেলা করে দাও, আমার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে,—টাকা দুর্লভ বলেই প্রার্থনীয় ; টাকা ঢেলার মত সুলভ হলেই মানুষ তাকে চাইবে না। তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন আমরা উল্টা কথা বলতে যাব ! কেন বল্‌ব তাঁকে আমরা সহজ করে অর্থাৎ সস্তা করে পেতে চাই ! কেন বল্‌ব আমরা তাঁর সমস্ত অসীম মূল্য অপহরণ করে তাঁকে হাতে হাতে চোখে ফিরিয়ে বেড়াব।

না, কখনো তা আমরা চাই নে। তিনি আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই আমাদের আনন্দ। শেষ নেই, শেষ নেই, জীবন শেষ হয়ে আসে তবু শেষ নেই। শিশুকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কত নব নব জ্ঞানে ও রসে তাঁকে পেতে পেতে এসেছি, না জেনেও তাঁর আভাস পেয়েছি, জেনে তাঁর আস্বাদ পেয়েছি, এমনি করে' সেই অনন্ত গোপনের মধ্যে নূতন নূতন বিস্ময়ের আঘাতে আমাদের চিত্তের পাপড়ি একটি একটি করে' একটু একটু করে' বিকশিত হয়ে উঠ্‌চে। হে গূঢ় ! তুমি গূঢ়তম বলে'ই তোমার টান প্রতিদিন মানুষের জ্ঞানকে প্রেমকে কর্ম্মকে গভীর হতে গভীরতরে

আকর্ষণ করে' নিয়ে যাচ্ছে। তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই অতল গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি ভোলাচ্চে, তার বন্ধন আল্‌গা করে দিচ্চে, তার জীবন মরণের তুচ্ছতা দূর করচে; তোমার এই পরম গোপনতা থেকেই তোমার বাঁশির মধুরতম গভীরতম সুর আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আস্‌চে; মহত্ত্বের উচ্চতা, প্রেমের গাঢ়তা, সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ, সমস্তই তোমার ঐ অনির্ব্বচনীয় গভীরতার দিকে টেনে নিয়ে আমাদের সুধায় ডুবিয়ে দিচ্চে। মানবচিত্তের এই আকাঙ্খার আবেগ এই আনন্দের বেদনাকে তুমি এমনি করে চিরকাল জাগিয়ে রেখে চিরকাল তৃপ্ত করে' চলেছ। হে গুহাহিত তোমার গোপনতার শেষ নেই বলে'ই জগতের যত প্রেমিক যত সাধক যত মহাপুরুষ তোমার গভীর আহ্বানে আপনাকে এমন নিঃশেষে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন; এমন মধুর করে' তাঁরা দুঃখকে অলঙ্কার করে' পরেছেন, মৃত্যুকে মাথায় করে' বরণ করেছেন! তোমার সেই সুধাময় অতলস্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ করেছে তারাই পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লুটচ্ছে—তারা, বল তেজ সম্পদ সমস্ত হারিয়েছে—তাদের চেষ্টা ও চিন্তা কেবলি ছোটো ও জগতে তাদের সমস্ত অধিকার কেবলি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। নিজেকে দুর্ব্বল কল্পনা করে' তোমাকে যারা সুলভ করতে চেয়েছে তারা মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চ গৌরবকে ধুলায় লুণ্ঠিত করে' দিয়েছে।

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে তুমি তারি চিরন্তন বন্ধু,—প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া।" তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে' না দেখি। তোমাদের ঐ পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে ততই তার কাব্য সঙ্গীত ললিতকলা অনির্ব্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠচে, ততই তার জ্ঞান, সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম্ম, স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য-সীমা অতিক্রম করচে —তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠচে।

তোমার সেই চিরন্তন পরম গোপনতার অভিমুখে আনন্দে যাত্রা করে চল্‌ব—আমার সমস্ত যাত্রাসঙ্গীত সেই নিগূঢ়তার নিবিড় সৌন্দর্য্যকেই যেন চিরদিন ঘোষণা করে, —পথের মাঝখানে কোনো কৃত্রিমকে কোনো ছোটোকে কোনো সহজকে নিয়ে যেন ভুলে না থাকে—আমার আনন্দের আবেগধারা সমুদ্রে চিরকাল বহমান হবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে' যেন মরুবালুকার ছিদ্রপথে আপনাকে পথিমধ্যে পরিসমাপ্ত করে' না দেয়।

সৃষ্টির বিশালতা।

ভূতলের কোন স্থানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া যদি তাহাকে ক্রমেই গভীরতর করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়। ইহার পরও গভীর করিতে থাকিলে গর্ত্তটি ভূপৃষ্ঠের অপর প্রান্তে গিয়া শেষ হয়। তখন আর সেটি গর্ত্ত থাকে না, একটা আট হাজার মাইল দীর্ঘ ঋজু সুড়ঙ্গে পরিণত হয়। ইহার এক প্রান্তে মুক্ত

আকাশ, অপর প্রান্তেও মুক্ত আকাশ, এবং ঠিক মাঝে পৃথিবীর কেন্দ্র অবস্থান করে।

এখন সুড়ঙ্গে একখণ্ড পাথর ফেলিয়া দিলে তাহার অবস্থা কিপ্রকার হয় বিবেচনা করা যাউক।

পৃথিবীর আকার গোল বলিয়া ইহার আকর্ষণী শক্তি কেন্দ্রেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাজেই প্রস্তরখণ্ডটি কেন্দ্রের দিকেই ছুটিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়াই ইহা স্থির থাকিবে না। ভূতল হইতে কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়া যাইতে যে বল সঞ্চার করিয়াছে তাহাই উহাকে কেন্দ্র ছাড়াইয়া সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে উপস্থিত করাইবে। কিন্তু এখানেও জিনিসটি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইবে না। কেবল ক্ষণিকের জন্য স্থির থাকিয়া সেটি আবার কেন্দ্রের দিকে নামিতে আরম্ভ করিবে। ঘড়ির দোলক (Pendulum) যেমন অবিরাম চলাফেরা করে, প্রস্তর-খণ্ডটিকে সেই প্রকার-ঘূর্ণগতি ভোগ করিতে হইবে। কোন প্রকার বাধা না পাইলে উহা চিরকাল সুড়ঙ্গ-পথে পৃথিবীর এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ক্রমাগত যাওয়া আসা করিতে থাকিবে।

জিনিসকে যতই ঊর্দ্ধ্ব হইতে ফেলা যায় ভূতলে পড়িবার সময় তাহার বেগ ততই বাড়িয়া চলে। এই বেগবৃদ্ধির নিয়ম নির্ণয় করা মোটেই কঠিন নয়। গতিবিজ্ঞানের ইহাই প্রথম সূত্র। সুতরাং সুড়ঙ্গ-পথের সেই প্রস্তর-খণ্ডটি পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইলে যে, কত বেগবান্ হইবে তাহা আমরা সহজেই স্থির করিতে পারি। এই প্রকার হিসাবে দেখা গিয়াছে কেন্দ্রে পৌঁছিলে উহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় পাঁচ মাইল হইয়া দাঁড়ায়।

এখন মনে করা যাউক, ভূগর্ভে যত শিলামৃত্তিকা প্রভৃতি লঘু-গুরু পদার্থ আছে তাহার শতকরা ৯৯ ভাগ যেন আমরা স্থানান্তরিত করিয়া, বাকি একভাগকে কোন গতিকে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছি। বলা বাহুল্য এই অবস্থায় সেই প্রস্তর খণ্ডটি তাহার ভ্রমণ পথটিকে কখনই ত্যাগ করিবে না। নূতন ব্যবস্থায় তাহার বেগের পরিমাণ কমিয়া যাইবে মাত্র।

আর একবার কল্পনা করা যাউক, যেন পৃথিবীর সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি পরস্পরের দূরত্বের অনুপাতকে ঠিক রাখিয়া লক্ষ লক্ষ মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে। ব্যাসের পরিমাণকে হঠাৎ লক্ষ লক্ষগুণ বড় করিয়া পৃথিবীকে ফাঁপাইয়া তুলিলে, সে যতটা স্থান অধিকার করিত এখন সেই বিচ্ছিন্ন শিলা এবং মৃৎপিণ্ডগুলি ঠিক সেই স্থানই জুড়িয়া থাকিবে।

শতকরা ৯৯ ভাগ মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করায় সেই সুড়ঙ্গের শিলাখণ্ডের বেগ অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। এখন আবার অবশিষ্ট অংশগুলি দূরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায়, উহার বেগ আরো কমিয়া আসিবে, কিন্তু সুড়ঙ্গ দ্বারা যে পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, উহা কোনক্রমে তাহা ত্যাগ করিবে না।

আমাদের সূর্য্য যে নক্ষত্র পুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক তাহা যে কত বৃহৎ, সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী নিউকুম্ব সাহেব, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন। নিউকুম্বের বিশেষ পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। ইনি জ্যোতিষিক গণানার যে সকল কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, অদ্যাপি গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি নির্ণয়ে তাহাই অবলম্বিত হইতেছে। যাহা হউক, যে অসংখ্য মহাসূর্য্যের ন্যায় নক্ষত্রগণ কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ লইয়া

এই মহাকাশে বিচরণ করিতেছে তাহাদেরই সমবেত আকর্ষণের পরিমাণ নির্ণয় করা নিউকুম্ব সাহেবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একবারে বৃহৎ ব্যাপার লইয়া হিসাবে বসিলে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। ক্ষুদ্রকে লইয়া কোন একটা সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে, তাহাকেই টানিয়া বৃহতের দিকে অগ্রসর হইলে অনেক সময় হিসাবের সুবিধা হয়। নিউকুম্ব সাহেব আমাদের পরিচিত ব্রহ্মাণ্ডটিকে পঞ্চাশ কোটি সূর্য্যের ন্যায় নক্ষত্র দ্বারা গঠিত বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং যে মহাশূন্যের এক-প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক-রশ্মি পৌঁছিতে ত্রিশ হাজার বৎসর অতিবাহিত করে এ প্রকার একটা স্থানে* ঐ মহাসূর্য্য-গুলি বিচ্ছিন্নভাবে সজ্জিত আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তা'র পর আমাদের উদাহরণের সেই প্রস্তর খণ্ডটির ন্যায় কোন একটা সূর্য্যকে এই পঞ্চাশ কোটি সূর্য্যের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া সেটি মহাকাশে দোলকের ন্যায় যাওয়া আসা করিতে করিতে কতটা বেগ অর্জ্জন করিবে হিসাব করিয়াছিলেন। ভূগর্ভের সুড়ঙ্গে প্রস্তরখণ্ডের বেগ কেন্দ্রের নিকটে সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল হইতে দেখা গিয়াছে। পঞ্চাশ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে যে মহাসূর্য্যকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহার চরম বেগ নিউকুম্ব সাহেবের হিসাবে সেকেণ্ডে পঁচিশ মাইল হইতে দেখা গিয়াছিল।

যে জিনিস কোন শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া ঘণ্টায় এক মাইল বেগে চলিতেছে, তাহাকে দুই মাইল বেগে চালাইতে হইলে শক্তির পরিমাণকে চারিগুণ করিতে হয়। তিন গুণ বেগে চালাইতে হইলে শক্তির মাত্রাকে নয়গুণ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি পঞ্চাশ কোটি সূর্য্য সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের মধ্যস্থ কোন নক্ষত্রকে সেকেণ্ডে ২৫ মাইল বেগ দিতে পারে। সুতরাং যে নক্ষত্রটি মহাকাশের ভিতর দিয়া সেকেণ্ডে দুইশত মাইল বেগে চলাফেরা করিতেছে, তাহা যে কতগুলি নক্ষত্রের টানে পড়িয়া এই বেগ অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন হয় না। দুই শত মাইল বেগ পঁচিশ মাইল বেগের ঠিক আট গুণ। কাজেই কোন জ্যোতিষ্কে এই বেগ উৎপন্ন করিতে হইলে পঞ্চাশ কোটির চৌষট্টিগুণ অর্থাৎ ৩২০০০,০০০,০০০ তিন হাজার দুইশত কোটি সূর্য্যের সমবেত আকর্ষণ আবশ্যক হইয়া পড়িবে।

নক্ষত্রগুলিকে আমরা অতি ক্ষুদ্র আ-লোক বিন্দুর ন্যায় দেখি বটে, কিন্তু ইহারা সত্যই ক্ষুদ্র পদার্থ নয়। সকলেই এক একটি সূর্য্যের ন্যায় তেজসম্পন্ন ও বৃহৎ, কোন কোনটি আমাদের সূর্য্য অপেক্ষাও অনেক বৃহৎ। তা ছাড়া ইহাদের মধ্যে কোনটিই নিশ্চল নয়, প্রতি সেকেণ্ডে শত শত মাইল বেগে আমাদের উদাহরণের সেই দোলক প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় মহাকাশকে ভেদ করিয়া ইহারা যাওয়া আসা করিতেছে। আমাদের সূর্য্যটি সেই অসংখ্য তারকাগুলির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র তারা। নানা গ্রহচন্দ্র ও ধূমকেতুতে পরিবৃত থাকিয়া ইহা প্রতি সেকেণ্ডে তের মাইল বেগে অভিজিৎ (Vega) নামক নক্ষত্রটিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটি-তেছে। আধুনিক জ্যোতিষিগণ যতগুলি নক্ষত্রের বেগের পরিমাণ অনুমান করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই

* প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে আলোক ধাবিত হয়। যে দূরত্ব অতিক্রম করিতে এই আলোকই ত্রিশ হাজার বৎসর অতিবাহিন করে তাহা কত বৃহৎ, পাঠক অনুমান করুন।

বেগ প্রতিসেকেণ্ডে দুইশত মাইলের অধিক বলিয়া মনে হয়। স্বাতী (Arcturus) নামক নক্ষত্রটি সেকেণ্ডে ৫৪ মাইল বেগে ধাবমান হইতেছে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আরো একটি নক্ষত্র দুইশত মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক বেগে তাহার গন্তব্য দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং আকাশের যে সকল মহাসূর্য্যের সমবেত আকর্ষণে নক্ষত্রগুলির বেগ দুই শত মাইলের অধিক হইতেছে, তাহাদের সংখ্যা যে পূর্ব্বোক্ত তিন হাজার দুই শত কোটির অনেক অধিক তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

খালি চক্ষুতে আমরা ছয় হাজারের অধিক নক্ষত্র দেখিতে পাই না। যে সকল জ্যোতিষ্ক অতি দূরে থাকিয়া তাহাদের ক্ষীণ আলোক নিয়তই পৃথিবীর দিকে প্রেরণ করিতেছে, আমাদের দুর্ব্বল দর্শনেন্দ্রিয় তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। কাজেই অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রসকল আমাদের চক্ষুর অগোচরেই রহিয়া গেছে। ফোটোগ্রাফের কাচে আকাশের ছবি উঠাইলে,এই শ্রেণীর অনেক দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের চিত্র কাচে ফুটিয়া উঠে। এই প্রকারে আধুনিক জ্যোতিষিগণ দশ কোটির অধিক নক্ষত্রের সন্ধান পান নাই। তিন হাজার দুইশত কোটি নক্ষত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নিউকুম্ব সাহেব যে গণনা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রে আবিষ্কৃত এই দশ কোটি নক্ষত্র কত তুচ্ছ পাঠক অনুমান করুন! অনন্ত মহাকাশের যে একটু স্থানে কোটি কোটি মহাজ্যোতিষ্ক আমাদের সূর্য্যের সহিত অবস্থান করিতেছে, নিউকুম্ব সাহেব এই গণনার কেবল তাহারি একটু পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। আকাশের অপর অংশের সংবাদ জ্যোতিঃশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গুলি এতই দুর্ব্বল এবং পর্য্যবেক্ষণের যন্ত্রসকল এত অক্ষম যে, এই ক্ষুদ্র সৌর জগতেরই সংবাদ এখনো সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। সুতরাং আমাদের এই নক্ষত্রপুঞ্জের বাহিরে কোন্ নীহারিকারাশি কোন্ মহাসূর্য্যকে প্রসব করিতেছে তাহা আমরা অনুমানই করিতে পারি না! অনন্ত মহাকাশ ও অনন্ত সৃষ্টির কথা মনে করিলে যে আনন্দময়ের ইচ্ছায় এই জড় ও শক্তি লীলা বিশ্ব ব্যাপিয়া অনাদি কাল ধরিয়া চলিতেছে, এক তাঁহাকেই চিন্তা করিয়া স্তব্ধ থাকা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় থাকে না।

আচার নিয়ম।

আর্য্যাবর্ত্ত ব্যতীত অন্য কোন ভূখণ্ডে আচারের জন্য কোনরূপ নিয়ম বা পদ্ধতি, অথবা কোনরূপ শাস্ত্র সংকলিত হয় নাই। কেবল মাত্র এই আর্য্যাবর্ত্তেই আচার প্রতিষ্ঠার জন্য নানা প্রকার বিধি-নিষেধ-ঘটিত শাস্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে। যে সময়ে এই দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে অদ্য যাবৎ এই দেশে আচার-নিয়মের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ-ভাবে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত আছে। সে নিয়ম কেহ প্রতিপালন করুক বা না করুক, তদ্ঘটিত আদেশের অর্থাৎ বিধি নিষেধের বিলোপ এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। যাঁহারা আচার নিয়ন্তা ঋষি, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন ও কার্য্যতঃ দেখিয়াছিলেন, যেমন তদ্বির না করিলে শস্য ফলাদির ও পশু পক্ষী প্রভৃতির জাতিভাব ঠিক্ থাকে না; অধিকন্তু বিকৃত হইয়া যায়, আর তদ্বির করিলে ঐ সকলের পর পর উৎকর্ষ হইতে থাকে, তেমনি, মনুষ্যদিগেরও জাতিভাব, বিনা তদ্বিরে বিকৃত হইতে থাকে এবং তদ্বির রাখিলে তাহা ঠিক্ থাকিতে পারে।

শস্য ফলাদির পক্ষে যেমন পরকীয়ভাষা তদ্বির, তেমনি, মানবীয় জাতিভাবের পক্ষে সংস্কৃত ভাষার আচার প্রায় সমানার্থক শব্দ। তাই আমরা "তদ্বির কর," এরূপ না বলিয়া 'আচারনিষ্ঠ হও" এইরূপ বলিয়া থাকি।

কেহ কেহ ভাবেনও বলেন, আচার শাস্ত্রটা কেবল কুসংস্কারাবিষ্ট পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভণ্ডামীর উপকরণ মাত্র। কিন্তু ঐ কথা আমাদের মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। আমাদের মনে হয়, মানবগণের শারীর-প্রকৃতি জাতীয়-প্রকৃতি ও দেশ-প্রকৃতি সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া বুধগণের মনে যে সকল হিত অহিতের বিষয় উপলব্ধ হইয়াছিল, এ দেশের আচার শাস্ত্রে সেই গুলিই বিধি-নিষেধ দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। দেখাও যায়, এ দেশে এমন কতকগুলি রোগ জন্মে, যাহা দেশান্তরে জন্মে না। এমন কি সে দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে সে সকল রোগের নাম প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত নাই। পরন্তু এ দেশের আচার-শাস্ত্রে এ ন সকল বিধি ও নিষেধ আছে যাহা পালন করিলে, সেই সকল রোগের দোষ বৃদ্ধি হইতে পারে না। এমনও দেখা যায়, কোন কোন সংক্রামক রোগের প্রাবল্য কালে অধিকাংশ আচারবান্ লোক সেই সেই রোগের সংক্রমণ হইতে নিস্তার পায়। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, আচার শাস্ত্রের সমগ্র বিষয় কুসংস্কারাবিষ্ট লোকের বৃথা কল্পিত নহে। অল্প একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, এ দেশের আচার শাস্ত্রের কতক কতক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য, কতক জাতীয় উৎকর্ষের জন্য, কতক বা সমাজহিতের জন্য এবং কতক পশু-পক্ষাদির ন্যায় যাদৃচ্ছিকতা নিবারণের জন্য সংকলিত। যে শাস্ত্রকে আমরা এখন স্মৃতি বলি, তাহাই আমাদের অভিহিত আচার শাস্ত্রের সার সংকলন। বধুগণ স্মৃতিবাক্য সকলকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া বলেন :যে, ইহার কতক বাক্য দৃষ্টার্থ, কতক অদৃষ্টার্থ ও কতক দৃষ্টাদৃষ্ট উভয়ার্থ। এই তিনের মধ্যে যাহাকে উভয়ার্থ বলা হইল, বোধ হয় তাহাই আমাদের বর্ণিত জাতীয় ভাবের সংরক্ষক, সংস্কারক ও উৎকর্ষকারক। সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রকে আচারশাস্ত্রের নামান্তর বিশেষ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

আচারশাস্ত্রে একটী নিষেধ বাক্য আছে, বাক্যটীর ভাষা অর্থ—প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথিতে যথাক্রমে পঞ্চদশ দ্রব্য ভক্ষণ করিও না। ঐ নিষেধ বাক্য বোধ হয়, পশ্চাৎ ব্যক্তব্য কারণে প্রচারিত। ৪।৫টী পরিণত বার্ত্তাকু ছেদন করিয়া খুব ভাল অনুবীক্ষণ যোগে দেখিবে। পরে দেখিতে পাইবে, কোন না কোনটীর রসে যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম এক প্রকার কীটাণু ভাসমান্ আছে। সেই কীটাণু বার্ত্তাকু রসে, ত্রয়োদশী তিথিতে উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।* কীটাণু ভক্ষণে দুর্লক্ষ্য অপকারের সম্ভাবনা, বোধ হয় তাহাতেই ত্রয়োদশী তিথিতে বার্ত্তাকুভক্ষণ নিষিদ্ধ। অনুসন্ধান লভ্য ঐ সকল নিগূঢ় বিষয় যিনি বিদিত হন, তিনি আচারনিষ্ঠতার সুফল ও ভ্রষ্টাচারের কুফল আছে বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য।

আচার নিষ্ঠতার দ্বারা মানবীয় জাতিভাবের উৎকর্ষ ও আচারভ্রষ্টতার দ্বারা তাহার অপকর্ষ জন্মে, এ তথ্য মনুমহর্ষিরও উপদিষ্ট। মনুমহর্ষি বলিয়া গিয়াছেন—

"অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাৎযুগাৎ।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।"

বীজ, ক্ষেত্র, কর্ম্ম, এই তিনের সমবায়ে ও উৎকর্ষাপকর্ষে জায়মান্ শস্য ফলাদির উৎকর্ষাপকর্ষ হয়। ঐরূপ বীজ, ক্ষেত্র, কর্ম্ম, এতৎ ত্রিতয়েরও তারতম্য ও উৎকর্ষাপকর্ষে মনুষ্যজাতিরও উৎকর্ষাপকর্ষ সংঘটন হয়। কোন নীচ জাতীয় মানব যদি ক্রমিক সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট আচারে কাল কর্ত্তন করে, তাহা হইলে সেই নামজায় মূল মানবের অধস্তন সপ্তম সন্তান শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে। ঐ প্রকারে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত, তথা ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

"ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈব চ।"

ক্ষত্রসন্তানের পক্ষেও বৈশ্যসন্তানের পক্ষেও ঐ রূপ নিয়ম। এই বিষয়ে একটী পৌরাণিক সংবাদ এই যে, বিশ্বামিত্র ঋষি আগে ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে তপস্যার প্রভাবে (তদ্বির করিয়া) ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠের প্রতি তাঁহার ঘোরতর ঈর্ষা জন্মিয়াছিল, তাই তিনি ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তির পর ঈর্ষা ও অভিমান বশতঃ ব্রাহ্মণ্য দেখাইবার উদ্দেশে বশিষ্ঠ সমীপে আগমন ও হস্তোত্তলন পূর্ব্বক নমস্কার করিয়াছিলেন। নমস্কার ও প্রতিনমস্কার সম্বন্ধে রীতি ও শাস্ত্র এই যে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলে প্রতিনমস্কার করিবেন, আর ক্ষত্রিয়াদি নমস্কার করিলে আশীর্ব্বাদ করিবেন। বশিষ্ঠ প্রতিনমস্কার না করিয়া পূর্ব্বের মত আশীর্ব্বাদই করিলেন। ইহাতে বিশ্বামিত্র বুঝিলেন, বশিষ্ঠ আমার ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিলেন না। পরে তিনি প্রতিবিধান মানসে পুনর্ব্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবার তাঁহার উপাস্য দেবতা তদীয় প্রত্যক্ষে আবির্ভূত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রের ক্ষোভ বিজ্ঞাত হইয়া বলিলেন, তুমি আবার যাও, এবার তুমি অভিসম্পাত করিও, তাহাতে বশিষ্ঠের মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। অনন্তর বিশ্বামিত্র এবার হৃষ্ট হইয়া অভিসম্পাতের সংকল্প বহন পূর্ব্বক বশিষ্ঠ সকাশে আসিলেন ও পূর্ব্বের মত নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। পরন্তু বশিষ্ঠ এবারও প্রতি নমস্কার করিলেন না, পূর্ব্বের ন্যায় আশীর্ব্বাদই করিলেন। বশিষ্ঠের তাদৃক্ ব্যবহারে বিশ্বামিত্রের ক্রোধ ও অভিসম্পাতের ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু এবার সে ক্রোধ ও সে ইচ্ছা সে অভিমান সমস্তই

* পরীক্ষা সাপেক্ষ। সহ সং।

বিদ্যুতের ন্যায় উদয় মাত্রে বিলীন হইয়া গেল। তৎ-ক্ষণাৎ তাঁহার মনে ব্রাহ্মণোচিত সাত্বিকী বৃত্তি ক্ষমার আবির্ভাব হইল। রাজসী বৃত্তি ঈর্ষাদি ক্রোধাদির অভিভব হইয়া গেল। তখন তাঁহার, বশিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারজনিত অসন্তোষ বিদূরিত হইল। ভাবিলেন, কেন আমি বৃথা ঈর্ষা দ্বেষ হিংসার কার্য্য করিয়া পাপে লিপ্ত হইয়াছি। বশিষ্ঠ আমার ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করুন বা না করুন, আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অল্প-ক্ষণ এইরূপ চিন্তার পর তিনি পুনর্নমস্কার করিয়া যথাগত স্থানে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে বশিষ্ঠ এবার তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, এবং বলিলেন নমস্কার মহাশয়! নমস্কার! বুঝিলাম, আপনি এখন যথার্থ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। যখন প্রথম আসিয়াছিলেন, তখন আপনার অন্তরে অল্প একটু ক্ষত্র-প্রকৃতির প্রতি-চ্ছায়া ছিল। ক্ষণমাত্র হইল সে টুকুও গিয়াছে।

স্কন্দ-পুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে লিখিত আছে, দাক্ষিণা-ত্যের কতকগুলি শূদ্র ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরামের সহায়তা করায় পরশুরাম সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া-ছিলেন। যদিও তাহারা বিশ্বামিত্রের ন্যায় তদ্দেহেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি, তদবধি তাহারা ও তাহাদের বংশধরেরা অবিচ্ছেদে ও ধারাবাহিক রূপে ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণসংসর্গ করিয়াছিল। পরে তাহাদের অধস্তন পুরুষেরা সকলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। অদ্যাপি তদ্বংশধরেরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাস করিতেছে। কখন কখন মনে হয় বটে, ব্রাহ্মণ একটা ব্যবহারিকী সংজ্ঞা মাত্র, পরন্তু তাহা অনন্থসন্ধান মূলক। অনুসন্ধানে জানা যায়, বিলক্ষণ বুঝা যায়, যাহারা ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তাহাদের বাহিক মুখ কান্তি, শ্রী-সৌষ্ঠব ও আভ্যন্তরীণ শিরা স্নায়ু ধমনী মর্ম্ম মস্তিক ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্তই ভিন্ন স্বভাবান্বিত ও ভিন্ন প্রকার শক্তিসমন্বিত। আহার বিহার সংসর্গ ও মানসী শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা দেহের অন্তর্বাহ্য পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট অংশ গঠিত ও অপকৃষ্ট অংশ অন্তর্হিত, আবার অপকৃষ্ট অংশ গঠিত ও উৎকৃষ্ট অংশ অস্ত হইয়া থাকে।

গর্ভাবাস কালেই মনুষ্যদিগের জ্ঞানের ইচ্ছার ও ক্রিয়ার বীজ তাহাদের দেহের যথাযথ স্থানে প্রকৃতি কর্ত্তৃক উপ্ত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে সকল আগন্তুক উপায়ে অর্থাৎ আহার বিহার সংসর্গ ও শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে অঙ্কুরিত ক্রমে অঙ্কুরিত ও ক্রমে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করে। সুতরাং বুঝা যায়, আহার বিহার সংসর্গ শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষা দীক্ষা-দির অনুরূপ জ্ঞানশক্তির ইচ্ছাশক্তির ও কার্য্যশক্তির বীজ সকল অন্যথা অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় ও সে সকলের বিস্তৃতিও অন্যথা অন্যথা ভাবে হইয়া থাকে। এই দৃষ্ট নিয়মটী আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মণের শূদ্র হওয়া ও শূদ্রের ব্রাহ্মণ হওয়া দূরে থাকুক, মানুষের পশু হওয়া ও পশুর মানুষ হওয়াও সুসম্ভব। ক্ষেত্র যেমন তেমনিই থাকে, পরন্তু তদুৎপন্ন শস্যাদি অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে বুঝা উচিত যে, মানুষের পৈত্রিক আকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না, পরন্তু তদন্তর্গত প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবাদি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিনটীকেই আমরা অন্তর্গত প্রকৃতি বলি।

কোন এক সময়ে আমি একখণ্ড মাসিক পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। যদি ঐ প্রবন্ধে প্রকাশ্য বিষয়টী সত্য হয়, তাহা হইলে সেই ঘটনাটি আমার সিদ্ধান্তের উত্তম উদাহরণ হইবে। মাসিক পত্রিকাটীর নাম "প্রবাহ"। প্রবন্ধের প্রথমেই লেখা আছে এ প্রবন্ধ একটী বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদ পত্রের অনুবাদ। সুতরাং তাহা এখনকার লোকের বিশ্বাস্য। প্রবন্ধটীর নাম (The wolf-man) অর্থাৎ ব্যাঘ্র পালিত মনুষ্য। প্রব-ন্ধের সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ—

"পশ্চিম প্রদেশস্থ সেনাবিভাগের কোন এক উচ্চ পদস্থ সাহেব এক দিন এক অরণ্যে শীকার করিতে গিয়াছিলেন। সহসা এক দুর্গম স্থানে গিয়া দেখিলেন, একটা অদ্ভূত জানোয়ার বাঘের মত থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে। জন্তুটার আকৃতি অর্থাৎ দেহের গঠন মনুষ্যের মত, অথচ সে থাবা পাতিয়া বসিয়া বাঘের মত জিহ্বা বাহির করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে বাঘের মত গোঙরাই-তেছে। আরও দেখিলেন, ইহার সৃক্কনী দিয়া অজস্র লালা নির্গত হইতেছে। ইহার চক্ষু গোল, দীপ্তিশালী ও রক্তবর্ণ এবং নখ বক্রীভূত ও প্রখর। সাহেব এই অদ্ভূত জন্তু দেখিয়া সহসা ভীত হইলেন বটে, কিছুক্ষণ পরে তিনি ভয় পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি ইহাকে ধরিবার উপায় কি, ভাবিতে লাগিলেন। সাহেব নিকটস্থ হইতে না হইতে সে সাহেবকে আক্রমণে উদ্যত হইল। কিন্তু সাহেব অনেক কৌশলে তাহার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সমভিব্যাহারী লোকজনের সাহায্যে তাহাকে ধৃত করিলেন।

পরে পিঞ্জর রুদ্ধ করিয়া তাহাকে আপনার অবস্থিতি স্থানে আনয়ন করিলেন। প্রচার হইলে, এই অদ্ভূত জীব দেখিবার নিমিত্ত নানাস্থান হইতে নানা লোক আগমন করিতে লাগিল। দর্শকেরা সকলেই অনুমান করিয়াছিল, জন্তুটা প্রকৃত মনুষ্য নহে, পরন্তু ব্যাঘ্রপালিত মনুষ্য। ক্রমে সে ভাত রুটী খাইতে শিখিয়াছিল, শান্ত হইয়াছিল এবং মনুষ্যের মত কথাও কিছু কিছু বুঝিতে ও

বলিতে শিখিয়াছিল, এবং মনুষ্যের ন্যায় অল্প অল্প হাঁটিতেও শিখিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু কাল পরে সে রক্তামাশয় রোগে মারা গেল। ভবিষ্যতে সে কিরূপ হইত তাহা জানিতে পারা গেল না। তৎকালের লোক সকল এই জন্তুর বর্ণনায় এইরূপ জল্পনা করিত যে এক শ্রেণীর বাঘ আছে, তাহারা সুযোগ পাইলে মনুষ্য-শিশু গো-বৎসাদি পশু মুখে লইয়া পলায়ন করে। বোধ হয় এই শ্রেণীর কোন বাঘিনী কর্তৃক কোন মনুষ্য-শিশু উক্ত ক্রমে নীত হইয়াছিল, এবং কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে শিশু তৎকর্তৃক ভক্ষিত না হইয়া প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাই সে মানুষ হইয়াও মনুষ্যত্বে বঞ্চিত ও ব্যাঘ্র-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সংবাদ পত্রের প্রচারিত এই ব্যাঘ্র পালিত মনুষ্যের ইতিহাস যদি সত্য হয়, তাহাতে বোধ হয় প্রাগুক্ত কারণে জাত্যন্তরাপত্তি হওয়ার কথা অসম্ভবপর হইবে না।

জগত-জননা।

জগত-জননী হে ভারতভূমি
রাখিয়াছ তুমি কি ধন অন্তরে।
যাহারি কারণে দারুণ পীড়নে
রহিয়াছে প্রাণ এতকাল ধরে।

মানব জাতির কি নিগূঢ় কথা,
আছয়ে তোমার মরমেতে গাঁথা,
কি ধন গোপনে রেখেছ যতনে
মানব সন্তানে বিলাবার তরে।

নানা দিকে দিকে এ মানবগণ,
করিছে কতই জ্ঞান আহরণ,
এই জ্ঞান ধন করি উপার্জ্জন
মিলিত হইবে তোমার মাঝারে।

সর্ব্ব-জ্ঞান-খনি যে পরশমণি,
মিলাবে যাহাতে সবাকারে তুমি,
সে অমূল্য মণি অন্তরেতে তুমি
মানব-জননী রহিয়াছ ধরে।

এ বারতা যবে জানিবে জগত,
বুঝিয়ে তোমার করম মহত,
হেরিয়ে তোমায় বিদরি হৃদয়
ভাসিবে ভাসাবে সবে আঁখিধারে।

করিবারে এই মণির রক্ষণ,
গোপনেতে তুমি জাগ অনুক্ষণ,
তব জাগরণ জানে কোন জন
আছে কত তপ তাহার ভিতরে।

জানিও মানব বিনা তপস্যার,
হতে নারে কভু হেন জ্ঞানোদয়,
তব তপ ফল এই জ্ঞান বল
রয়েছে সঞ্চিত তোমার মাঝারে।

জগত যে দিন হইবে সক্ষম,
এই জ্ঞান-মণি করিতে ধারণ,
তব আত্ম ধন পরম রতন
প্রকাশিবে তুমি ল'য়ে নিজ করে।

আত্মার প্রকাশে ভেঙ্গে মোহ-কারা
আনন্দিত হবে সসাগরা ধরা
সে আনন্দ ধারা করে' মাতোয়ারা
ডুবাবে মানবে অমৃতের ধারে।

অন্তরে বাহিরে আত্মার প্রকাশ
তব কীর্ত্তি এই অপূর্ব্ব বিকাশ
থাকিবেক মাতঃ হইয়ে গ্রথিত
মানবেতিহাসে জলদ অক্ষরে।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রার্থনা।

আমি আর শুনিবনা কাহারো বচন,
আর কিছু লক্ষ্য করি যাবেনা জীবন।
জগদীশ প্রেমময়, তব রূপে এ হৃদয়
পূর্ণ করে জেগে থাক মোহিয়া নয়ন।
তুমি শিক্ষাময় গুরু, তোমারি চরণ
ধ্যান ধারণায় লক্ষ্য, আকাঙ্খা স্বপন।
যে পথে যাইবে লয়ে, যাব সেই পথ দিয়ে
যাতনা দুঃখের থাক্ কণ্টক ভীষণ।
ওগো দেব দয়াময় নিখিল রঞ্জন,
দিও দীনে ওই তব কমল চরণ।
আমার এ মন প্রাণ সর্ব্বস্ব করেছি দান
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা হউক পূরণ

বিমল প্রভাত শুভ্র পূরব গগনে
রাঙা রবি আলো দেয় কনক কিরণে।
বিহগের মধু ছন্দে, মধুর কুসুম গন্ধে
কি অমৃত ঢালিতেছে এ বিবশ প্রাণে।
শীতল বাতাস বয়, শান্ত স্থির সমুদয়
ধরণী করিছে পূজা যেন এক মনে
জগদীশ প্রেমময় এ চিত্ত চঞ্চল হয়?
দয়া করে স্থির করি লও তব পানে।
বিশ্ব-রাগিনীর সুরে, মোর এই মর্ম্ম-পুরে
জাগাইয়া দাও তব মহিমার গানে।

মোর এই প্রাণমন, করি দিব সমর্পণ
তোমার অতুল ওই কমল চরণে
দীননাথ দয়া করে দেখ দীন জনে

প্রভাতের ফুল।

কি সুন্দর কি মাধুরী অমূল্য অতুল।
ক্ষুদ্র বৃক্ষ ভরিয়াছে শুভ্র ফুল দলে,
সুরভি নিঃশ্বাস বহে সমীর হিল্লোলে।
খুলিল পূরব দ্বার, প্রভাত তপন,
ঢালিয়া আলোক ধারা, করে সচেতন
অচেতন ধরণীরে, বিহঙ্গের দল
আনন্দে বিভুর নাম গাহিছে কেবল।
সাজায়ে ফুলের ডালা ক্ষুদ্র বৃক্ষ রাশি,
কাহার পূজার তরে উঠিল বিকাশি।
ক্ষুদ্র পুষ্প তবু তার সৌরভ মধুর,
শুভ্র পবিত্রতাময়, হৃদি অন্তঃপুর
অমনি পবিত্র আর, অমনি নির্ম্মল
করহ, পূজার তব নির্ম্মাল্য কেবল।

বসন্তের পাখী।

কি সুধা ঢালিছ তুমি ওঅলক্ষ্যে থাকি
ওই মধু কণ্ঠস্বরে বিমোহিত মন,
কোন সুধা-স্রোতে প্রাণ হতেছে মগন।
কে দিল ওকণ্ঠে সুধা ডাক পাখী কারে?
অদৃশ্য আছেন যিনি অনন্ত মাঝারে।
ওনির্ম্মল নীলাকাশে তরুণ তপন,
মায়াযন্ত্র পরশিয়া দিতেছে চেতন
সুপ্ত ধরণীরে, সেই স্পর্শে ফুলদল,
হাসিয়া মেলিছে আঁখি পবিত্র সরল।
ওআকুল কণ্ঠে পাখী ডাক শুধু তাঁরে,
মথিয়া আকুল হৃদি মধুর ঝঙ্কারে।
আমিও আকুল কণ্ঠে ওই সুধাস্বরে
যেন ডাকিবারে পারি অনন্ত ঈশ্বরে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নানা-কথা।

সদনুষ্ঠান।—কাশ্মীরের মহারাজা ভারতেশ্বরের সমগ্র ভারতীয় স্মৃতিসংরক্ষণ জন্য জম্বুতে দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিতে ও পঞ্জাবে ভারতেশ্বরের স্মৃতি সংরক্ষণ-ফণ্ডে পনের হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(এডুকেশন গেজেট।)

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১২৫৮৸৵৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩৪৯৪ /৬
সমষ্টি	...	৪৭৫২৸৶৯
ব্যয়	...	১৭৩১॥৵
স্থিত	...	৩০২১।/৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৪২১।/৯

৩০২১।/৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	...	৬৭৭।৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫০৸/০
পুস্তকালয়		৮৫। ৯
যন্ত্রালয়	...	৪০৫ ৶
ব্রঃ সঃ স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৩০ ৶৬
ইলেক্‌ট্রিক্‌ লাইট্‌		১০৲
সমষ্টি	...	১২৫৮৸৵৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১০৭১।৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯৫। ৩
পুস্তকালয়	...	২৫ /৬
যন্ত্রালয়	...	৪৩২৸৶৩
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১০৫।৶৬
ইলেক্‌ট্রিক্‌ লাইট	...	১।৵০
সমষ্টি		১৭৩১॥৵

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৮১।

৮০৬ সংখ্যা ১৮৩২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

(পঞ্চম উপদেশের অনুবৃত্তি)

অতএব রাজশক্তি সমাজ হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র নহে। কিন্তু এই সম্বন্ধে দুই লেখক-সম্প্রদায়ের দুই বিভিন্ন মত; এক সম্প্রদায় রাজশক্তির নিকট সমাজকে বলি দান দিতে চাহেন, আর এক সম্প্রদায় মনে করেন, রাজশক্তি সমাজের শত্রু। যদি রাজশক্তি সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ না হয়, তাহা হইলে সে শক্তি শুধু ভৌতিক শক্তি মাত্র,—সে শক্তি শীঘ্রই বলহীন হইয়া পড়ে; আবার, রাজশক্তির অবিদ্যমানে, সকলের সহিত সকলের যুদ্ধ বাধিয়া সমাজ, একটা বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। সমাজ রাজশক্তিকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে, এবং রাজশক্তি সমাজকে সর্ব্বত্র বিপদ হইতে রক্ষা করে। প্যাস্‌কাল যে বলিয়াছেন, "যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহাকে বলবান করিতে না পারিয়া, যাহা বলবান তাহাকে ন্যায়-সঙ্গত করা হইয়াছে"—এ কথা ঠিক্ নহে। প্যাস্‌কালের কথার স্থূল মর্ম্ম এই যে,—বাহুবলের দ্বারা বলীয়ান ন্যায়ই রাজশক্তি।

যে রাষ্ট্রনীতি, কর্ত্তৃত্বশক্তি ও স্বাধীনতাকে পরস্পর-বিরোধী মনে করিয়া, মূলত বিভিন্ন মনে করিয়া, রাজশক্তি ও সমাজের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেয়, সে রাষ্ট্রনীতি প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি নহে। আমি অনেকসময় এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রভুতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক্ তত্ত্ব, এবং প্রভুশক্তির বৈধতা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্যই প্রভুর সৃষ্টি। ইহা একটা বিষম ভুল। সহসা মনে হইতে পারে, এই কথার দ্বারা প্রভু-তত্ত্বকে স্থাপন করা হইতেছে; কিন্তু তাহা দূরে থাক, প্রভুত্বের যে সুদৃঢ় ভিত্তি সেই ভিত্তিটিকেই প্রভুত্ব হইতে অপসারিত করা হইতেছে। প্রভুত্ব—অর্থাৎ বৈধ ও নৈতিক প্রভুত্ব—উহা ন্যায় ছাড়া আর কিছুই নহে; এবং ন্যায়ও, স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ ঐ দুইটি বিভিন্ন ও বিপরীত তত্ত্ব নহে, উহা একই তত্ত্ব। সকল অবস্থাতেই,

সকল প্রয়োগস্থলেই উহাদের সমান ধ্রুবত্ব —সমান মহত্ত্ব।

কেহ কেহ বলেন প্রভুশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে ঃ অবশ্য ঈশ্বরের নিকট হইতেই আসিয়াছে; ভাল— স্বাধীনতা কোথা হইতে আসিয়াছে? পৃথিবীতে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট সবই ত ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে। স্বাধীনতা হইতে উৎকৃষ্ট জিনিস আর কি আছে?

প্রভুশক্তির মূল ভিত্তিটি জানিতে পারিলে, প্রভুর বল আরও বৃদ্ধি পায়। প্রভুর আজ্ঞা পালন করা সহজ হয়, যদি জানিতে পারি, ঐ আদেশ পালনে আমার হীনতা হইবে না, প্রত্যুত আমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

এই আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দাসত্বের সাদৃশ্য ধারণ না করিয়া, স্বাধীনতার অপরিহার্য্য নিয়মরূপে, স্বাধীনতার প্রতিভূরূপে প্রকাশ পাইবে।

রাজশক্তির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ও চরম লক্ষ্য কি?—না, সার্ব্বজনিক স্বাধীনতার রক্ষক যে ন্যায়ধর্ম্ম সেই ন্যায়ধর্ম্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং অন্যের স্বাধীনতাকে দমন করিবার অধিকার কাহারও নাই। অতএব, মিথ্যাকথন, অমিতাচার, অপরিণামদর্শিতা, বিলাসিতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি চারিত্রদোষ যতক্ষণ না অন্যের অনিষ্টজনক হয়, ততক্ষণ রাজশক্তি তাহার জন্য কাহাকে দণ্ডিত করিতে পারে না। আবার রাজশক্তিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যেও বদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নহে।

সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ-সরকারও একটি নৈতিক পুরুষ; ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় তাহারও একটা হৃদয় আছে; তাহার উদারতা আছে, সাধুভাব আছে, বদান্যতা আছে। এমন কতকগুলি বৈধ ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত তথ্য আছে যাহার কোনরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না, যদি প্রজার অধিকার সংরক্ষণই রাজসরকারের একমাত্র কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। যাহাতে প্রজাগণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিপুষ্ট হয়, তাহাদের ধর্ম্ম-নীতি দৃঢ়ীভূত হয়,—জনসমাজের ও বিশ্বমানবের স্বার্থের উদ্দেশে—তৎপ্রতি রাজসরকারের কিয়ৎপরিমাণে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সেই জন্য কখন কখন, মানুষের হিতকল্পে, রাজসরকারের বলপ্রয়োগ করিবারও অধিকার আছে। কিন্তু এই বলপ্রয়োগে বিশেষ বিবেচনা ও বিজ্ঞতা আবশ্যক—কেননা, অপব্যবহারে এই বলপ্রয়োগ অত্যাচারে পরিণত হইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাক, রাজসরকার কিরূপ নিয়মে রাজশক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। যে শক্তি রাজসরকারের হস্তে বিশ্বস্তভাবে অর্পিত হইয়াছে, রাজসরকার যদৃচ্ছাক্রমে কি সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন? সদ্যোজাত সমাজেই,—শাসনতন্ত্রের শৈশব দশাতেই, সেই শক্তির এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু এই শক্তির প্রয়োগে মানুষ নানা প্রকারে বিপথগামীও হইতে পারে,—এক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত, আর এক, বলের আতিশয্য প্রযুক্ত। অতএব এমন একটি নিয়ম চাই যাহা মানুষের নিজের চেয়ে উচ্চতর, এমন একটি সর্ব্বজনবিদিত বিধি চাই, যাহা প্রজাগণের পক্ষে উপদেশস্বরূপ হইতে পারে এবং যাহা রাজসরকারের পক্ষে যুগপৎ আটক ও আশ্রয় উভয়ই হইতে পারে। এই নিয়মবিধিকেই আইন বলে।

আইনের আইন—সেই সর্ব্বোচ্চ আইন কি?—না স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়ধর্ম্ম; উহা লিখিত হয় না; উহার বাণী প্রতিজনের

অন্তরে শ্রুত হয়। স্বাভাবিক ন্যায়ধর্ম্ম অমুক অমুক স্থলে কি আদেশ করে, লিখিত আইন তাহাই অসম্পূর্ণরূপ প্রকাশ করে মাত্র।

উত্তম আইনের প্রধান লক্ষণ, অপরিহার্য্য লক্ষণ এই যে উহাতে একটা বিশ্বজনীন ভাব থাকে। যত প্রকার অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে, সেই প্রত্যেক অবস্থাতে ন্যায়ধর্ম্মের আদেশ কি হইতে পারে, তাহাই সাধারণভাবে নির্দ্ধারণ করা আইন-প্রণেতার প্রথম কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, ঐরূপ কোন একটি অবস্থা উপস্থিত হইলে তিনি সেই নির্দ্দিষ্ট আদেশ অনুসারেই দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সেই অবস্থায় বিচার করিতে সমর্থ হন।

যে সকল নিয়ম কিংবা আইন ব্যক্তিগণের সামাজিক সম্বন্ধ নিয়মিত করে, সে সমস্তের সমবায়কে সামাজিক ব্যবহার বলে, সামাজিক ব্যবহার স্বাভাবিক সম্বন্ধজনিত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত; স্বাভাবিক অধিকারই উহার ভিত্তি, উহার মানদণ্ড, উহার সীমা। সমস্ত সামাজিক বিধিব্যবস্থার প্রধান নিয়ম এই যে, উহা স্বাভাবিক বিধি-ব্যবস্থার বিরোধী হইবে না।

কোন নিয়মই আমাদের স্কন্ধে একটা মিথ্যা অধিকার চাপাইতে পারে না, কিংবা একটা সত্য অধিকার হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারে না।

আইনের শাসনশক্তি কিসে প্রকাশ পায়?—না, দণ্ডবিধানে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাপের ধারণা হইতে দণ্ড নিঃসৃত হইয়াছে। বিশ্বশাসনতন্ত্রে ঈশ্বর স্বয়ং সকল প্রকার অপরাধের জন্য দণ্ড বিধান করেন। সমাজ-তন্ত্রে রাজসরকার, শুধু সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্যই দণ্ডবিধানের অধিকার পাইয়াছেন; রাজসরকার তাহাদিগকেই দণ্ড দেন, যাহারা অন্যের স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করে। অতএব যে কোন দোষ ন্যায়ধর্ম্মের বিরোধী নহে এবং স্বাধীনতার ব্যাঘাতকারী নহে, সেই দোষের জন্য সমাজ কোন প্রতিশোধ লয় না। তা ছাড়া, দণ্ডবিধানের অধিকার ও প্রতিশোধ লইবার অধিকার এক নহে। মন্দ কাজের প্রতিশোধ লইবার জন্য মন্দ কাজ করা, চক্ষের বদলে চক্ষু ও দন্তের বদলে দন্তের দাবী করা,—ইহা জ্ঞানালোকবর্জ্জিত একপ্রকার বর্ব্বরোচিত ন্যায়বিচার। কেননা, তুমি আমার যে অনিষ্ট করিয়াছ, তোমার অনিষ্ট করিয়া আমি সে অনিষ্টকে কখনই অপসারিত করিতে পারি না।

অত্যাচারপীড়িত ব্যক্তির কষ্ট হইয়াছে বলিয়া অত্যাচারীকে যে তাহার অনুরূপ কষ্ট দিতে হইবে, একথা ঠিক্ নহে, পরন্তু যে ব্যক্তি ন্যায়কে লঙ্ঘন করে, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে সমুচিত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে—ইহাই দণ্ডের প্রকৃত নীতি। দণ্ড ক্ষতিপূরণ নহে। যদি আমি অজ্ঞাতসারে তোমার কোন ক্ষতি করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী। তাহাতে কোন দণ্ড বর্ত্তে না, কেননা, এস্থলে আমি জ্ঞাতসারে অপরাধ করি নাই। কিন্তু আমি যদি কোন বদমাইসির কাজ করিয়া থাকি, আর সে কাজে যদি কাহারও ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহার আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য ত দায়ী আছিই, তাহা ব্যতীত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমাকে উপযুক্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত দণ্ডনীতি।

—

উদ্ভিদের আত্মরক্ষা।

মানুষের আকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষের মত সংসারে টিকিয়া থাকা যায় না। ঘরে বাহিরে আমাদের যে সকল শত্রু আছে, তাহাদের আক্রমণ হইতে আমরা যদি নিজেকে রক্ষা করিতে পারি, তবেই এই বিশাল জগতের এক প্রান্তে আমাদের স্থান হয়। নচেৎ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

যে গৃহস্থ নিজের ঘটিবাটিগুলাকে না সামলাইয়া এবং টাকা কড়ির বাক্স খুলিয়া অবারিতদ্বারে গৃহে সুখে নিদ্রামগ্ন থাকে, প্রভাতে তাহার যথাসর্ব্বস্ব তো পাওয়াই যায় না, সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামীর জীবনান্তেরও সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। এ প্রকার গৃহস্থ সংসারে বা সমাজে টিকিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই বাহিরের শত্রুর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাড়িখানিকে ঘেরিয়া রাখিতে হয়। টাকা কড়ির বাক্সে একটা তালা লাগাইতে হয়। টাকা অধিক থাকিলে প্রহরীর ব্যবস্থা করিতে হয় এবং হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিলে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দু' একখানা অস্ত্র শস্ত্রও নিকটে রাখারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। এ ছাড়া শত্রুদমনের জন্য মানুষকে অধিক কিছু করিতে হয় না।

প্রকৃতির সহিত মানুষের খুবই বৈরিতা আছে। বাতাস একটু ঘন হইলে তাহাতে শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাত হয়। কাজেই শরীর টিকে না। সেই বাতাসই একটু পাতলা হইলে হাঁফ লাগে। মানুষ রুদ্ধশ্বাস হইয়া মারয়া যায়। যে সকল ব্যাধির জীবাণু ঝাঁকে ঝাঁকে চারিদিকে ঘুরিয়া-বেড়াইতেছে, কোন গতিকে তাহারা দেহে উপনিবেশ স্থাপন করিলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এ সকলই সত্য। কিন্তু ইহাদের দমনের জন্য মানুষকে একটুও চেষ্টা করিতে হয় না। যে জগদীশ্বর এই সকল প্রবল শত্রুর মধ্যে মানুষকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনিই উহাদিগকে দমন করিবার জন্য স্বহস্তে সুব্যবস্থা করিতেছেন। ভগবানের বাণী ও প্রকৃতির নির্দ্দেশ না মানিয়া জীবনযাত্রার উপায়টাকে আমরা যখন অত্যন্ত কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলি, তখনই প্রকৃতি আমাদের বৈরী হয়। যে সকল রক্তপিপাসু শত্রুদল চারিদিকে থাকিয়াও পূর্ব্বে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না, তাহারাই আমাদিগকে ছদ্মবেশে আবৃত দেখিয়া তখন সংহারকার্য্য সুরু করিয়া দেয়।

এক মানুষ লইয়াই জগৎ নয়। কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সহস্র সহস্র অপর প্রাণীও মানুষের ন্যায় জাতিবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে। ঠিক আমাদেরি মত উহাদের সুখদুঃখ ও ভয়ক্রোধের অনুভূতি এবং বৈরিতা ও সখ্যতা বুঝিবার শক্তি আছে। শত্রুর পীড়ন হইতে ত্রাণ পাইয়া সহজে জীবনটাকে কাটাইবার জন্য যে টুকু বুদ্ধির আবশ্যক, ভগবান্ ইহাদিগকেও তাহা মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। জীবরাজ্যের আর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, উদ্ভিদ জাতীয় সহস্র জীব ভূতলকে ছাইয়া রহিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া শতবর্ষজীবী মহাতরু সকলেই এই বৃহৎ খণ্ড-রাজ্যের প্রজা। মানুষ ও ইতর প্রাণীদিগের ন্যায় ইহারা সুখদুঃখ ভয়ক্রোধ অনুভব করিতে পারে কি না জানি না। তবে যে স্থূল বুদ্ধিদ্বারা বন্য পশুরা নিভৃত স্থানে গুহা রচনা করে এবং পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সুখে জীবনটাকে

কাটাইয়া দেয়, সে বুদ্ধিটুকু যে উদ্ভিদের নাই তাহা সুনিশ্চিত। যে অনাথ ও নিঃসহায়, এক ভগবানই তাহার সহায় হন। তাঁহারি দূত প্রকৃতি সহস্র উপায়ে তাহাকে জীবিত রাখে। বহু শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত অসহায় উদ্ভিদগুলিকে প্রকৃতি কি কৌশলে রক্ষা করে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারি কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

প্রাণীদিগের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল, আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগের শরীরেই কতকগুলি সুব্যবস্থা থাকে। কচ্ছপ ও শম্বুক জাতীয় প্রাণীর দেহ কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত হইলেই, নিজের দেহকে সেই সহজ বর্ম্মের মধ্যে লুকাইয়া ফেলে। মধুমক্ষিকার বিষাক্ত হুল, হরিণ ও গো-জাতির শৃঙ্গ আত্মরক্ষারই অস্ত্র। উদ্ভিদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও এই প্রকার তাহাদের দেহেই বর্ত্তমান। মানুষ বা অপর প্রাণীদিগের শত্রু এক প্রকারের নয়। এজন্য শত্রুর প্রকৃতি বুঝিয়া ইহাদিগকে নিরাপদ থাকিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। উদ্ভিদ্গণও ঠিক সেই প্রকারে বিশেষ উপায়ে বিশেষ বিশেষ শত্রুর উপদ্রব নিবারণ করে। যে সকল বৃক্ষের পাতা সুস্বাদু, ক্ষুদ্র পতঙ্গ তাহাদের পরম শত্রু। ইহাদের আক্রমণ নিবারণের জন্য পাতাগুলিকে শুঁয়ো দ্বারা আবৃত থাকিতে দেখা যায়। কচি পাতা স্বভাবতঃই পুরাতন পাতা অপেক্ষা কোমল। কাজেই কচি পাতাগুলিকে কীট পতঙ্গের উপদ্রব অধিক সহ্য করিতে হয়। এই কারণে যে সকল বৃক্ষের পত্রে বিকৃত স্বাদ নাই, তাহাদের নবপত্রগুলি পরীক্ষা করিলে লম্বা লম্বা অনেক শুঁয়ো দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি এমন বিচিত্র ভাবে পাতার উপর সজ্জিত থাকে যে, কোনক্রমে ক্ষুদ্র পতঙ্গ তাহাদিগকে ঠেলিয়া পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে উদ্ভিদ-দেহে আত্মরক্ষার অনুকূলে যে সকল পরিবর্ত্তন আসে, তাহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়?

গত শতাব্দীতে ডারুইন্, হক্সলি, স্পেন্সার ও ওয়ালেস্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটি লইয়া খুবই আলোচনা করিয়াছিলেন। আজকাল আবার মেণ্ডেলের শিষ্যবর্গ ও ডেভ্রিজ্ প্রমুখ অনেকে সেই ব্যাপারটিকেই নূতন ভাবে আলোচনা করিতেছেন। এই সকল আলোচনা হইতে উদ্ভিদ্দেহের পরিবর্ত্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান কতকটা বুঝা যাইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি ইহার মূলে এত রহস্য রহিয়া গিয়াছে যে, যদি কেহ ব্যাপারটিকে অব্যাখ্যাত বলিয়া প্রচার করেন তবে অধিক কিছুই বলা হয় না।

যাহা হউক এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাউক। ইহাঁদের বক্তব্যের স্থূল মর্ম্ম এই যে, একই পিতামাতার সন্তানদিগের মধ্যে যেমন নানা রূপান্তর দেখা যায়, সেই প্রকার বীজ হইতে যখন নূতন বৃক্ষ জন্মায়, তখন সকল সময় তাহাদের আকার প্রকার ঠিক মূল বৃক্ষের অনুরূপ হয় না। কোন গাছের পাতা যদি লম্বা থাকে, কখন কখন তাহারি চারায় অপেক্ষাকৃত গোলাকার পাতা দেখা যায়। মূল বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট ও বৃহৎ হইলে হয় ত তাহারি একটি চারার ফল ক্ষুদ্র ও বিস্বাদ হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তনগুলির কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে প্রকৃতির খেয়াল (Freaks) বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। খেয়ালই হউক বা উদ্দেশ্যমূলক হউক,

এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্ত্তন যে আসৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত।

জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত খেয়াল-পরিবর্ত্তনগুলিতেই উদ্ভিদের নানা অঙ্গের স্থায়ী পরিবর্ত্তনের মূল দেখিতে পাইয়াছেন। আত্মরক্ষার উপযোগী যে সকল সুব্যবস্থা উদ্ভিদ-দেহে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাদেরও মূলে ঐ খেয়াল বর্ত্তমান। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন, যে উদ্ভিদের সুস্বাদু পাতাগুলিকে পতঙ্গে নষ্ট করিতেছে, খেয়ালে পড়িয়া তাহার কোন এক সন্ততি যদি কয়েকটি শুঁয়ো লইয়া জন্মগ্রহন করে, তবে এই খেয়াল তাহার জীবনরক্ষার অনুকূল হইয়া পড়ে। কীট পতঙ্গ ইহার পাতাগুলিকে আর নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই গাছটি নিরুপদ্রবে বাড়িয়া নিজের বীজ দ্বারা শুঁয়োযুক্ত অনেকগুলি নূতন চারা উৎপন্ন করিবার সুযোগ পাইয়া যায়। অবশেষে বংশধরগণের মধ্যে প্রত্যেকে সেই শুঁয়োর সাহায্যে জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া এমনটি হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন ইহাদিগকে সেই কীটবিদ্ধ মূলবৃক্ষের সন্তান বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

আমরা কেবল শুঁয়োযুক্ত উদ্ভিদের অভিব্যক্তির একটা উদাহরণ দিলাম। প্রত্যেক উদ্ভিদে আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারের জন্য যেসকল সুব্যবস্থা আছে, তাহার সকলই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিতেছেন। যে সকল উদ্ভিদ গোমহিষাদির ভক্ষ্য, তাহাদের কোন বংশধর কেবল শুঁয়োযুক্ত হইয়া জন্মিলে সংসারে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তনে উভয়ের ভক্ষ্য ভক্ষক সম্বন্ধ লোপ পায় না। কিন্তু উহাদেরি বীজ কোন বিশেষ মৃত্তিকায় পড়িয়া কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় যদি তিক্ত বা উগ্রগন্ধযুক্ত দেহ লইয়া অঙ্কুরিত হয়, তবে পশুদিগের সহিত সংগ্রামে ইহাদের আর পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের দেশের বেল, লেবু ও তুলসীর পাতার উগ্রগন্ধ এবং প্রথমোক্ত দুইটি উদ্ভিদের কাঁটার উৎপত্তি পশুদিগের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বেল ও লেবু গাছের নীচেকার ডালগুলিতেই অধিক কাঁটা দেখা যায়। অনেক সময় উঁচু ডালে মোটেই কাঁটা থাকে না। সুতরাং পশুদিগের উপদ্রব শান্তির জন্যই যে ক্রমে এই সকল উদ্ভিদ-দেহে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

আমাদের দেশের ময়না গাছ পাঠক হয়ত দেখিয়া থাকিবেন। ইহার প্রত্যেক ডালের প্রত্যেক গ্রন্থিতে লম্বা লম্বা কাঁটা সজ্জিত থাকে। মনে হয়, কোনকালে বন্য পশুগণ পাতা খাইতে গিয়া উহার ডালগুলিকে ভাঙিয়া ফেলিত। কাজেই এই উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ডালের সর্ব্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ কাঁটা বাহির করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। খেজুর গাছের পত্রশীর্ষের কাঁটাগুলি যে পশু তাড়াইবার মহাঅস্ত্র, তাহা একবার দেখিলেই বুঝা যায়। কাঁটাগুলি ধারাল সূচের ন্যায় প্রত্যেক পাতার অগ্রভাগে সাজানো থাকে। ইহা দেখিয়া কোন পশুই আহারের চেষ্টায় বৃক্ষ স্পর্শ করে না। ফল পাকিলে পক্ষিগণও কাঁটা ঠেলিয়া সহসা সেগুলিকে নষ্ট করিতে পারে না।

উদ্ভিদের শত্রু কেবল ভূপৃষ্ঠেই বিচরণ করে না। মাটির তলেও ইহাদের শত্রু আছে। মূল ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষগুলিকে মারিয়া ফেলা ইহাদের প্রধান কাজ। কাঁটা বা শুঁয়োদ্বারা এই সকল শত্রুকে তাড়ানো

যায় না। কাজেই শত্রুদমনের জন্য অপর কোন সুকৌশলের আবশ্যক। উদ্ভিদসকল অন্য কোন উপায় না পাইয়া নিজের মূলগুলিকে অত্যন্ত বিস্বাদ এবং কখন কখন বিষাক্ত করিয়া পোকার উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করে। ওল ও কচুর মূল সত্যই বিষাক্ত। পোকার উৎপাত এগুলিতে কদাচিৎ দেখা যায়।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি স্বাবলম্বী ও ক্ষমতাশালী, তাহারি চারিদিকে অনেক অতিথি আসিয়া জোটে। এই প্রকার আশ্রয়াকাঙ্ক্ষীদিগকে প্রায়ই অক্ষম ও দুর্ব্বল হইতে দেখা যায়। কোন গতিকে পরের স্কন্ধে ভরদিয়া দিনযাপন করা তাহাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। উদ্ভিদদিগের মধ্যে যাহারা স্বাবলম্বী ও আত্মরক্ষায় নিপুণ, তাহারাই অনাদৃত অবস্থায় মাঠে ঘাটে জন্মায়, এবং নিজেকে নিজেই নানা উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া যথাকালে মরিয়া যায়। বেড়ার গায়ে আমরা যে শেয়ালকাঁটা ইত্যাদি গাছ লাগাই, তাহা বাগানের গন্ধরাজ ও মল্লিকা গাছ অপেক্ষা অনেক উন্নত। শেয়ালকাঁটা তাহার কাঁটার সাহায্যে নিজেকে নিজে সর্ব্বদাই রক্ষা করে, কিন্তু এক ঝাড় মল্লিকাকে মাঠের মাঝে পুতিয়া দিলে সেগুলি কখনই আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবে না। যাহা হউক উদ্ভিদ্দিগের মধ্যে যাহারা স্বাবলম্বী, তাহাদিগকে দেখিতে শুনিতে নিতান্ত সাদাসিধে ও আড়ম্বরহীন হইলেও আশ্রিত প্রতিপালন ব্যাপারে ইহারা সহৃদয় মানুষের মতই উদার। শেয়ালকাঁটা, বুনো খেজুর বা বড় বড় কাঁটার ঝোপগুলির তলা খুঁজিলে অনেক নিঃসহায় ও দুর্ব্বল উদ্ভিদ্‌কে সেখানে জন্মাইতে দেখা যায়। আত্মরক্ষার উপযোগী কোন ব্যবস্থাই ইহাদের দেহে থাকে না। কাজেই কাঁটাঝোপের ন্যায় কোন নিরুপদ্রব স্থান মনোনীত করিয়া না লইলে ইহাদের জীবন সংশয় হইয়া পড়ে।

বিছুটি গাছের পাতায় যে লম্বা লম্বা শুঁয়ো জন্মায়, তাহা সত্যই বিষাক্ত। কোন গতিকে পাতা গায়ে ঠেকিলেই গা ফুলিয়া উঠে। এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি বিছুটির নিকটে আসিতে পারে না বটে, কিন্তু গো-মহিষাদি বড় বড় জন্তু শুঁয়ো দেখিয়া একটুও ভয় পায় না। কাজেই এই সকল প্রাণীদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহাদিগকে অপর আর একটা কিছু করিতে হয়। পল্লীগ্রামের বন জঙ্গলে পাঠক যদি বিছুটির গাছগুলিকে লক্ষ্য করেন, তবে দেখিবেন, দুর্গম কাঁটা-ঝোপের তলই ইহাদের জন্মস্থান। কেবল বিছুটি নয়, অনেক দুর্ব্বল উদ্ভিদকে ঠিক এই প্রকারেই মহতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কাঁটাঝোপ আমাদের হিসাবে অতি নিকৃষ্ট উদ্ভিদ হইলেও উদ্ভিদজগতে তাহারা অগতির গতি স্বাবলম্বী মহৎ জীব।

মানুষ ভগবানের নিকট হইতে যে একটু বুদ্ধি পাইয়াছে, তাহারি সাহায্যে সে এখন অপর জীব হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের চলাফেরা, আচারব্যবহার; আহারবিহার প্রভৃতিতে যে কৃত্রিমতা আছে, তাহাই যেন ঐ স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। মানুষ নিজে যে পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা যে কোথায় গিয়া শেষ হইবে ভগবানই জানেন ; কিন্তু ইহারা কতকগুলি নিকৃষ্ট জীবের উপর আধিপত্য করিয়া যে তাহাদের ধ্বংসের পথ নিয়তই পরিষ্কার করিতেছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিড়াল কুকুর ঘোড়া গোরু ইত্যাদি প্রাণীগুলিকে

মানুষ তাহার কৃত্রিম জীবনের গণ্ডীর ভিতর টানিয়া লইয়া সেগুলিকে এখন এত অসহায় করিয়া তুলিয়াছে যে, এখন জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনটির পূরণের জন্য উহারা মানুষের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে।

শৃঙ্গ গো-মহিষাদি পশুর আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। মানুষ নানা উপায় অবলম্বন করিয়া শৃঙ্গহীন পশু উৎপন্ন করিতেছে। কুকুর যে সকল গুণ পাইয়া এপর্য্যন্ত নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছিল, মানুষের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহা একে একে হারাইতে বসিয়াছে। কাজেই যদি কোন কারণে আজ হঠাৎ সমগ্র মনুষ্যজাতির উচ্ছেদ হয়, তবে অপর জীবদিগের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে না পারিয়া পূর্ব্বোক্ত পশুদিগের বংশলোপ অনিবার্য্য হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক।

মানুষ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনেক উদ্ভিদ্‌কেও বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ কাঁটায় ঢাকিয়া কাঁটানটে গাছগুলি এপর্য্যন্ত বেশ নিরুপদ্রবে জীবন যাপন করিতেছিল। মানুষ কাঁটা ভাঙিয়া তাহাদিগকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে যে, এখন এক শ্রেণীর নটে গাছে আর কাঁটা জন্মায় না। কাঁটানটের এই নিষ্কণ্টক বংশধরগুলিকে বাগানের বাহিরে পুতিয়া দিলে, তাহারা বোধ হয় এক দিনের জন্যও পশুদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। গোলাপ গাছের পিতামহগণ যে খাঁটি বন্য ও স্বাবলম্বী ছিল, গায়ের কাঁটাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু মানুষের হাতে পড়িয়া উহাদের দুর্দ্দশা চরম-সীমায় পৌঁছিয়াছে। আজকাল নানা কৌশলে যে কাঁটাহীন গোলাপ গাছ উৎপন্ন করা হইতেছে, তাহাদের মত অসহায় উদ্ভিদ বোধ হয় আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাগানের বাহিরে এখন আর ইহাদের স্থান নাই।

প্রকৃত প্রার্থনা।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা এরূপ সাধকের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

মঙ্গলময় সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর, আমাদিগের ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী জড় দেহের বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের জন্য যেমন শরীর মধ্যে বুভুক্ষা-বৃত্তি দিয়াছেন, সেই প্রকার দেহাতীত চৈতন্যমাত্র অবিনাশী আত্মার উন্নতির জন্যও আত্মার মধ্যে ব্যাকুলতারূপ ক্ষুধা নিহিত করিয়া আপনার অসাধারণ করুণার পরিচয় দিয়াছেন।

ক্ষুৎপিপাসা ভিন্ন জীব-দেহ অন্ন-পানাদি গ্রহণ করিতে পারেনা; পান ভোজনই শরীরের বৃদ্ধি ও বলপুষ্টির হেতু। কিন্তু অগ্নির অভাবে খাদ্যাদি পরিপাক প্রাপ্ত না হইলে এবং আহার্য্য বস্তু শরীর মধ্যে মিশ্রিত হইতে না পারিলে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে ধ্বংস মুখে পতিত হয়।

সেইরূপ আত্মাতে যদি অগ্নি না থাকে, তবে আত্মাও স্বীয় ক্ষুৎপিপাসার অভাবে আপনার আহারীয় বস্তুকে আহরণ করিতে অক্ষম হইয়া ক্রমশই হীন দশা প্রাপ্ত হয়।

যে বস্তু যে পদার্থ হইতে উৎপন্ন বা নির্ম্মিত, সে বস্তু সেই পদার্থ ভিন্ন পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। যাহার যাহা উপাদান, সেই উপাদানই তাহার সত্তা বা জীবন; আমাদের এই জড় শরীর যে

যে উপাদানে উৎপন্ন বা গঠিত, সেই সেই উপাদানই আমাদের দেহের আহার; উহা দ্বারাই দেহ রক্ষিত হয়।

সেইরূপ আত্মাও যে উপাদানে গঠিত, আত্মা সেই বস্তুকে আত্মার মধ্যে প্রাপ্ত না হইলে, আত্মারও বল পুষ্টির উপচয় হইতে পারে না। আত্মার উপাদানই আত্মার আহার।

শরীরস্থ অগ্নিই শরীরের উপাদান। ঐ অগ্নি ব্যায়ামাদি বা নিয়মিত পরিশ্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণ আপন আপন শরীরকে চালনা পূর্ব্বক জঠর অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া সেই অগ্নিতে অন্নাদি আহুতি দিয়া স্বীয় স্বীয় শরীরের পুষ্টি সাধন করেন। জড়শরীর অন্নাদি আপন অগ্নিবলে পাক করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

আত্মা জড় নহে, সৎচিৎআনন্দ মাত্র। জীবাত্মা সচ্চিদানন্দ পরমাত্মারই সন্তান। পরমাত্মাই জীবাত্মার উপাদান; সুতরাং সত্য জ্ঞান আনন্দবস্তু, জীবাত্মার আহার। উহা দ্বারাই আত্মা নিত্য-কাল পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। জড় বস্তু—রূপ রসাদিবিষয়ভোগ, আত্মার অন্নপান নহে; তাহা আত্মার পক্ষে অখাদ্য। সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ পরামাত্মাই আত্মার অন্ন এবং তিনিই আনন্দরূপে তাহার পানীয়। এই সত্যং শিব সুন্দরকে আপনাতে উপভোগ করিবার যে প্রবল আকাক্ষা, তাহাই আত্মার ক্ষুধা। জ্ঞানাগ্নিতেই চিন্ময় আত্মার বুভুক্ষাবৃত্তি প্রকাশিত হয়। জড় শরীরকে পরিশ্রম করাইলে যেমন জঠরাগ্নি প্রবৃদ্ধ হইয়া শরীরকে বল পূর্ব্বক আহার আহরণ করিতে প্রবৃত্ত করায়, সেই প্রকার জগতের সৃষ্টি স্থিতি পালন কার্য্যের আলোচনা, সাধুসঙ্গ সদালোচনা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও বিচাররূপ ব্যায়ামের দ্বারা আত্মার জ্ঞানাগ্নির উদ্দীপনা হয়; এই জ্ঞানাগ্নি প্রবল হইলে, সকল জ্ঞানের সকল সত্যের মূল যে পরমাত্মা, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যে আত্মার মধ্যে প্রবল ব্যাকুলতা আইসে, তাহাই আত্মার ক্ষুধা। ক্ষুধাতেই আহার সংগ্রহের বাসনা হয়। যাহার যেমন ক্ষুধা তাহার তদ্রূপ ভোজনের আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষার তারতম্যানুসারে ভোজনও সেইমত হইয়া থাকে এবং পুষ্টিও তাহার তদনুরূপ হয়। এই যে আকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষা হইতেই অক্ষম ব্যক্তির প্রার্থনার আবশ্যক হয়। যেখানে আকাঙ্ক্ষা সেই খানেই প্রার্থনার উদয়। যাহার যত অভাববোধ, তাহার তত আকাঙ্ক্ষা, এবং যাহার যত আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা, সেই পরিমাণে তাহার প্রার্থনারও গভীরতা। আমাদের আত্মার ক্ষুধা যত প্রবল হইবে, তাহার আহারের জন্য আকাঙ্ক্ষাও তত প্রবল হইবে। প্রবল আকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত দুর্ব্বল দরিদ্রগণের প্রার্থনা ভিন্ন বাসনা-পূরণের অন্য উপায় নাই। অক্ষমের একমাত্র প্রার্থনাই সম্বল। জীবাত্মা বড় অক্ষম। তাহার কিছুমাত্র শক্তি নাই। পরমাত্মার শক্তিতেই সে চলে, পরমাত্মার শক্তিতেই বলে, তাঁরই শক্তিতে দেখে, তাঁরই শক্তিতেই ভাবে; অনন্ত শক্তিমানের শক্তিতেই সে শক্তিমান। সুতরাং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে তাঁহার বলেই বলীয়ান হইয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। প্রার্থনাই আমাদের সম্বল, প্রার্থনাই আমাদের বল। বিনা প্রার্থনায় কেহ কিছু পাইতে পারে না। প্রার্থনা শব্দের অর্থই ভিক্ষা করা, যাচ্ঞা করা বা চাওয়া; না চাইলে পায় না, যে চায়, সেই পায়। আকাঙ্খা না হইলে

কেহ চায় না; অভাব বোধ না হইলে কাহারও আকাঙ্খা হয় না। চির-সহচর পরমেশ্বরের সুখসঙ্গের অভাব বোধ হইল; সে অভাব পূরণ করিবার যে প্রবল ইচ্ছা, তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা। কেবলমাত্র কতকগুলি কবিত্বসংযুক্ত স্তুতি বাক্য প্রার্থনা নহে, হৃদয়ের আন্তরিক আকাঙ্খাই প্রকৃত প্রার্থনা। যেমন অন্তরে প্রেম না থাকিলে কোনও ব্যক্তিকে মহামূল্য রত্ন দান করিলেও তাহা প্রকৃত প্রেম নহে, কিন্তু অন্তরে প্রীতি থাকিলে, অথচ কিছু দান করিতে না পারিলেও তাহাকে প্রকৃত প্রীতি বলে, সেই প্রকার পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য যে প্রাণের মধ্যে প্রবল আগ্রহ তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা। এই প্রার্থনা রূপ ক্ষুধার দ্বারা আত্মার আহার পরমাত্মা পরমান্ন স্বরূপে আত্মার সমীপে প্রকাশিত হয়েন, এই প্রার্থনার দ্বারাই তিনি লভ্য হয়েন; "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" পরমাত্মা কেবল মাত্র বাক্য দ্বারা বা তর্ক-শক্তির দ্বারা অথবা উপদেশ শ্রবণের দ্বারা লভ্য নহেন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" যিনি পরমাত্মার সহবাসের অভাব বোধে ব্যথিত হইয়া সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য শরীরে ক্ষুৎ-পিপাসাদ্দিতের ন্যায় ব্যাকুল ভাবে প্রবল আকাঙ্খা করেন, সেই প্রবল আকাঙ্খা-জনিত গভীর প্রার্থনাতে সচ্চিদানন্দস্বরূপে তিনি প্রকাশিত হয়েন; "তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাম্।"

তবে কি স্তব স্তুতি, তর্ক যুক্তি বা উপদেশাদি শ্রবণের প্রয়োজন নাই? আছে বই কি। এ সকল প্রথমাবস্থায় আত্মার বুবুক্ষা প্রবৃদ্ধি ও জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু যেমন অত্যধিক পরিশ্রমের সঙ্গে উপযুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজনাভাবে শ্রান্ত শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, সেইরূপ উপাসনার অভাবে কেবলমাত্র শুষ্ক তর্ক-বিতর্কে আত্মার ভাবও পরিশুষ্ক হইয়া যায়; এজন্যই কেবলমাত্র "বহু বচন, মেধা বা বহু শ্রবণের দ্বারা পরমাত্মা লভ্য নহেন" ইহা বলা হইয়া ছ। নচেৎ এ সকলেরও প্রয়োজন আছে। এই সকল শ্রবণ বচনাদির দ্বারা পরমেশ্বরে আসক্তি জন্মায়। কিন্তু সকলেরই কিছু তীক্ষ্ণ মেধা, তর্কশক্তি বা বহু শ্রবণ নাই, তাহাদের উপায় কি হইবে? সে সম্বন্ধেও প্রেমময় পিতা তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে ক্রুটী করেন নাই। অনেক দিবসের অগ্নিমান্দ্যজনিত পুরাতন রোগী যেমন স্বীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ ব্যায়ামাদির দ্বারা নষ্টাগ্নিকে পুনরুদ্দীপিত করিতে অশক্ত হইলে চিকিৎসক-প্রদত্ত কটু তিক্ত কষায়াদি ঔষধ সেবনে তাহা জাগ্রত হয়, সেই প্রকার বিবেকহীন বিচার-বুদ্ধিশূন্য জনগণের আত্মাতে ভগবৎ প্রাপ্তির আকাঙ্খা উদ্রিক্ত করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানই জগতের চিকিৎসক রূপে, বিপদ-আপদ রোগ-শোক দুঃখ-তাপ ঘৃণা-লাঞ্ছনা প্রভৃতি তিক্ত ঔষধের প্রয়োগে তাহাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা উদ্দীপিত করেন। জীবিতেচ্ছু রোগীগণকে যেমন চিকিৎসকের বশতাপন্ন হইয়া চিকিৎসককে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে হয়, তদ্রূপ আমাদেরও উচিৎ যে আমরা আমাদের পরম বৈদ্যের প্রদত্ত শোক দুঃখাদি তিক্ত ঔষধ গুলি তাঁহার শুভ ব্যবস্থা সম্ভূত ইহা স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য সহকারে যেন তাহা সেবন করি ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা করি। সংসার সুখ অনিত্য সুতরাং কুপথ্য, কিন্তু তিনিই সুপথ্য এই জ্ঞানাগ্নির উদয় হইলে তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণের

মধ্যে প্রবল ক্ষুধা জাগরিত হইবে। তখন আমরা ক্ষুধার যাতনায় কাতর হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিব। যিনি ক্ষুধার পূর্ব্বে অন্ন, তৃষ্ণার পূর্ব্বে জল, বাসের পূর্ব্বে বসুমতী, প্রতিপালনের পূর্ব্বে পিতা মাতা এবং ব্যাধির পূর্ব্বে ঔষধের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য পরমামৃত পরমান্ন হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন। সেই অমৃত পানে, মর্ত্ত্য আমরা অমর হইব। আহা তাঁহার কি অপরিসীম করুণা। আমাদিগকে অক্ষম দরিদ্র দেখিয়া বিনা মূল্যেই তিনি চিকিৎসা করিতেছেন; অযাচিত-ভাবে আমাদের ভবরোগ দূর করিয়া আপনিই সুপথ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আমাদের পিতা, আবার তিনিই আমাদের অন্ন; আমরা তাঁহা হইতে উৎপন্ন, আবার তাঁহাতেই জীবিত। আমাদের পিতাকে আত্মার অন্নরূপে পথ্যরূপে প্রার্থনা কর, বরণ কর। যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই সকলে বরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ বর্ত্তমানে অশ্রেষ্ঠকে কেহ বরণ করে না; যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে বরণ করিতে হইলে, অপর সকলকে তুচ্ছ বোধে পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাকে বরণ করা যায় না। যেমন কোনও বিবাহার্থিনী কন্যা স্বয়ম্বরা হইলে, স্বয়ম্বর-সভায় সকলকে নিকৃষ্ট বোধে পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহাকেই বরণ করে, সেইরূপ আমাদেরও উচিত যে আমরা ধন-জন-যশ-মানকে অশ্রেষ্ঠ জানিয়া সেই ত্রিভুবন বরেণ্যকে আমরা বরণ করিয়া লই। রোগী যদি আরোগ্যকে বরণ করিতে করিতে কুপথ্যকেও বরণ করে, তাহা হইলে যেমন তাহার আরোগ্যের আশা থাকে না, সেইরূপ পরমেশ্বরকে বরণ করিতে গিয়া যদি ধন মান যশকেও বরণ করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আশা করিতে পারি না। তাঁহাকে পাইতে হইলে ধন মানকে তুচ্ছ বোধ করিতে হইবে। সূর্য্যরশ্মি বহুদূর বিস্তৃত থাকিয়া নানা বস্তুতে বিভক্ত থাকায় যেমন তাহার তেজের হ্রাস হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সূর্য্য-কিরণ যেমন আতসী কাচ খণ্ডে বা সূর্য্যকান্তমণিতে ধারণ করিয়া একোমুখী করিলে তাহার তেজের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই প্রকার আমাদেরও আকাঙ্খা ধন-জন যশঃ-মান নানা বস্তুতে বিভক্ত হইয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। একারণ আমাদের আকাঙ্খার বল নাই; কিন্তু যদি আমাদের আকাঙ্খাকে পরমাত্মার দিকে একমুখী করিয়া রাখি, তাহা হইলে তিনি আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হইবেন। সকলের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র তাঁহাকে বরণ করিয়া লওয়াই তাঁহাকে প্রার্থনা। এই প্রার্থনাতেই তিনি আপন সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাধকের আত্মায় প্রকাশ করেন; যে সাধক অপর সকলকে অবর বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র তাঁহাকেই বরণ করে, তিনিও তাহাকে বরণ করিয়া লয়েন এবং তাহাতে আত্মস্বরূপ প্রকটিত করেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুংস্বাম্। ইহারই নাম প্রার্থনা। ক্ষুধা ভিন্ন তিনি আমাদের আত্মার রুচিকর হইবেন না বলিয়া, তিনি দয়া করিয়া আপনিই শোক তাপাদির দ্বারা ক্ষুধার উদ্রেক্ষনা করাইয়া আমাদের তৃপ্তিকারী হইতেছেন। যেমন তিনি শরীরের সুখের জন্য ক্ষুধা ও অন্ন দিয়াছেন, তেমনি তিনি আত্মার আনন্দের জন্য প্রার্থনা এবং আপনাকে দিতেছেন। তাঁহার প্রেমের পার নাই। কৃষক কৃষিকার্য্য করিয়া যেমন সেই কার্য্য দ্বারা শস্য প্রার্থনা করে, তন্ত্রীর বস্ত্র-বয়ন কার্য্যে যেমন তাহার বস্ত্রের প্রার্থনা প্রকাশ পায়,

সেই প্রকার আমাদের বাক্যের রচনা বা মনের ভাবমাত্র তাঁহার প্রার্থনা নহে। তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেই তাঁহার প্রার্থনা প্রকাশ পায়। তিনি বাক্য নহেন, যে তাঁহাকে স্তব স্তুতিতে পাইব, তিনি শব্দ নহেন, যে বহু শ্রবণে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে; তিনি দৃশ্য নহেন যে তাঁহার রূপ ধ্যান করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব, এবং তিনি কোনও বিচার্য্য বিষয়ও নহেন যে তাঁহাকে তীক্ষ্ণ মেধার দ্বারা পাইব। কারণ দৃশ্যকে দর্শনের দ্বারা এবং শব্দকেই শ্রবণের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যিনি দৃশ্য স্পৃশ্যাদির অতীত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা, সেই আত্মবস্তুকে আত্মার দ্বারাই পাওয়া যায়। আত্মদানই যথার্থ প্রার্থনা—যথার্থ বরণ। আপনাকে তাঁহাকে দিলে তিনিও আপনার হইবেন। আমরা তাঁহার হইলে তিনিও আমাদের না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। আত্মসমর্পণই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। বহু বাক্য, বহু শ্রবণ বা তীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা নহে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনাশ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাম্।"

হে পরমাত্মীয় পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া তোমার কর; তাহা হইলেই আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিব।

প্রার্থনা।

হৃদয় আবেগে আর বাসনার স্রোতে,
প্রতি দিন কত বাধা পাই পথে যেতে।
সংসারের মোহ মায়া আচ্ছন্ন করিয়া,
সদা রাখিয়াছে এই দৈন্য-ভরা হিয়া।
দূর করি দাও দৈন্য ও পুণ্য পরশে,
ফুটাও আশার ফুল হৃদয় সরসে।
তোমারে করিতে পারি একমাত্র আশা,
তোমাতেই তৃপ্ত হয় সমস্ত পিপাসা।
জগৎ সংসার হয় সুন্দর মধুর,
পুণ্য ভরা, পাপ তাপ করে দিই দূর।
শুদ্ধ শান্ত নিরমল পবিত্র হইয়া,
তোমারে পূজিতে হয় উপযুক্ত হিয়া।
দীন আমি দীন-নাথ তোমার শরণ
লয়েছি, কাতরে দাও অভয় চরণ।

সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত থাকি নিরন্তর
করিতে তোমার পূজা নাহি অবসর।
হায়রে অবোধ মন বৃথা আশা লয়ে
অমূল্য সময় তব যেতেছে বহিয়ে।
প্রতি দিন কর আশা, আজ নয় কাল
বেলা কেটে যায় বৃথা বাড়িছে জঞ্জাল।
আপনার ভারে নত পড়িছ ধূলায়,
কাঁদিছে এ ক্ষুদ্র প্রাণ সংসার মায়ায়।
এখনো সময় আছে দেখরে চাহিয়া,
ভুলে যাও মায়া মোহ কর মুক্ত হিয়া।
ডাকরে একান্ত মনে দয়াল ঈশ্বরে,
পুণ্য প্রেম প্রীতিধারা জাগিবে অন্তরে।
হৃদয় কমল দলে ভক্তির আসনে
বসায়ে হৃদয়-নাথে পূজ একমনে।

জ্ঞানময় যত জ্ঞান লভি তোমা হতে,
সে জ্ঞানের সীমা আর কোথা এ জগতে।
কোনো ঋষি কোনো যোগী সাধ্য নাহি কার
কোনো ধর্ম্ম গ্রন্থে তাহা নহে শিখিবার।
তোমার নিকটে আসি আকুল হৃদয়,
করিলে প্রার্থনা, পূর্ণ হয় সমুদয়।
ডাকিলে কাতর হয়ে অমনি তোমার
মুক্ত কর ওঅসীম দয়ার ভাণ্ডার।
ভিখারীর মনোবাঞ্ছা দাও পূর্ণ করে,
নিরাশা ব্যথিত হয়ে কেহ নাহি ফিরে।
তব দ্বার হতে প্রভু, তাই বড় আশা,
মিটাও প্রাণের মম ক্ষুধিত পিপাসা।
সর্ব্বকাজে সর্ব্বভাবে সকল সময়ে,
জাগ্রত দেবতা সম থাক এ হৃদয়ে।

দয়াময় এই নামে ভরে মোর প্রাণ,
কি সুধা আনন্দধারা লভি অবিরাম।
বিশ্বের রাগিণী সনে এই নাম গান
ঢালে শান্তি প্রীতি প্রাণে আনন্দ আরাম।
দয়াময় এই নাম নিখিল ভুবনে,
দয়াময় এই নাম জাগে রবি করে,
দয়াময় এই নাম সলিলে পবনে,
দয়াময় নাম জাগে তটিনী সাগরে।
পিতা মাতা প্রভুরূপে জাগিছ সবার,
ঢালিছ স্নেহের ধারা সমভাবে সবে,
অনাথের নাথ তুমি কেহ নাহি যার,
তাহার সর্ব্বস্ব হয়ে আছ এই ভবে।
তেমনি সর্ব্বস্ব হও হৃদয়ে আমার,
তোমাতেই মিশে থাক্ জগৎ সংসার।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞান।

বর্ত্তমান সময়ে যদি সেই উপনিষদ ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হইতে, তাহা হইলে আমরা শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গিয়া যদ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায় সেইরূপ উপদেশ গ্রহণ করিতাম। কিন্তু সে আশা কল্পনাতেই রাজত্ব করুক। উপনিষদের যুগে যে প্রণালীতে ধর্ম্ম-শিক্ষা হইত তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখা যায়। হায়! এখন তাহা উপনিষদেই থাকিয়া গেল। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিষ্যের প্রতি গুরুর প্রথম আদেশ এই—সত্যং বদ, ধর্ম্মঞ্চর, স্বাধ্যায়ান্মা-প্রমদ, সত্য কথা কহিবে, ধর্ম্মাচরণ করিবে, বেদাধ্যয়ন করিবে, দেব গুরু ও পিতৃকার্য্য করিবে, গুরুর নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া দক্ষিণা দিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না, কুশল (শুভ-কর্ম্ম) হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। মাতাকে দেবতুল্য পূজা করিবে, আচার্য্যকে দেবতুল্য পূজা করিবে, অতিথিকে দেবতুল্য পূজা করিবে। আমাদের (আচার্য্যদিগের) সুচরিত সকল অনুষ্ঠান করিবে, অন্য আচরণ (ধর্ম্ম-বিরুদ্ধাচরণ) অনুষ্ঠান করিবে না। দানধর্ম্ম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত করিবে না। বুদ্ধি বিনয় প্রভৃতির সহিত দান করিবে।

এই কয়েকটী উপদেশ মানব-জীবনের সকল কার্য্য-ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা করে। যদি এতদনুসারে জীবন-পথে চলিতে পারি, আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞানের সময় আর নাই। আমাদের সন্তানেরা কোথায় জ্ঞানলাভার্থে গমন করিবে? হয়ত একজন নাস্তিকের কাছে, কিম্বা চরিত্র-হীন শিক্ষকের কাছে, অথবা জ্ঞান-হীন আচার্য্যের কাছে। তাহার ফল—"অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ। বর্ত্তমান সমাজ এরূপ সত্যানৃতে মিশ্রিত যে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তাহা অতীব অনিষ্টকর।

বৈদিক সময়ে জ্ঞান ও পরাবিদ্যা অভিন্নার্থ ছিল। কিন্তু এখন সেই ব্রহ্মজ্ঞান অধ্যাপনা করিবার লোক কোথায়? প্রাচীন-কালে সকল বিদ্যাই গুরুগৃহে বাস করিয়া শিখিতে হইত। শ্বেতকেতু দ্বাদশ বর্ষ হইতে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গুরুগৃহে ছিলেন, তথাপি সকল শিখিতে পারেন নাই, কেবল "অনুচানমানী" মাত্র হইয়াছিলেন। পিতার নিকট পদে পদে অপ্রতিভ হইত। পিতাও সে কালে জ্ঞান-ধর্ম্মে সুশিক্ষিত ছিলেন। এখন সে পিতা ও সে শিক্ষক নাই।

বৈদিক সময়ে গুরুগৃহবাস ব্যতীত পরা কিম্বা অপরা কোন বিদ্যাই শিক্ষা হইত না। বর্ত্তমান সময়ে College Boarding system অর্থাৎ কলেজ-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে সেই রীতির একটী ক্ষীণ অনুকরণ দৃষ্ট হয়। অধ্যাপকেরা যদি নিজ নিজ ক্ষতিলাভের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রগণের সর্ব্ববিধ উন্নতির উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে গুরুগৃহবাসের কথঞ্চিৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। দ্বাদশ বর্ষ অথবা নয় বর্ষ ধরিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বী গুরুর নিকট বাস করার ফল যদিও বর্ত্তমানে নাই তথাপি অনেকদূর হইতে পারে।

কিন্তু কোথায় সেই ঔপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞান, কোথায় সেই শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য, আর কোথায় এই বর্ত্তমান যুগের বিদ্যা-শিক্ষা প্রণালী। যে বিদ্যা দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানিতে পারা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা সেই অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত এবং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, তাহার আশা নাই। বেদাচার্য্যেরাই দুঃখ করিয়া বলিতেন যে শুনিবার উপায়াভাবে অনেকে সেই অশ্রুত ব্রহ্মকে জানিতে পারে না এবং শুনিয়াও অনেকে তাঁহাকে জানিতে পারে না। "আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য-লব্ধা আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ"।

ঐশী-শক্তির ধারাবাহিকতা আছে। যে শক্তি ঋষিদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল, সে শক্তি এখনও কি কার্য্য করিতেছে না? ঊর্দ্ধে অধোতে সম্মুখে পশ্চাতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালে সেই একই শক্তি। কেবল ভারতবর্ষে কেন, অন্যান্য বর্ষে—কেবল ভূলোকে কেন,

অন্যান্য লোকেও সেই ব্রহ্মশক্তি। যদি ব্রহ্মশক্তিকে এই রূপে অনুভব করি, তাহাহইলেই যথার্থ তাঁহাকে দেখি। সীমাবিশিষ্ট ব্রহ্ম ব্রহ্ম-নামের বাচ্য নহে। সেই এক ব্রহ্ম শক্তি যেমন ধর্ম্মজগতে কার্য্য করিতেছে, সেইরূপ বিজ্ঞান-জগতেও কার্য্য করিতেছে। কোপার্নিকাশ যে জ্যোতিষ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সেই বিজ্ঞান অনুসন্ধানেই নিযুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞান জগতের ধারাবাহিকতা কখনও বিনষ্ট হইবে না। ধর্ম্মজগতে কি তবে তাহা বিনষ্ট হইবে? যাহা আমাদের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের মূল, তাহা অবিনশ্বর অক্ষরে মানব-হৃদয়ে চির-মুদ্রিত থাকিবে না? ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আমরা আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছি; উন্নতির ধারা কিছুদিনের জন্য রুদ্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু একেবারে তাহা পরিশুষ্ক হইবার নহে।

নানা-কথা।

দেবালয়।—বিগত ১৩ই ভাদ্র সোমবার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দেবালয়ে উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ইহার সহিত ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মের সম্বন্ধ।" তাঁহার বক্তৃতা মনোজ্ঞ হইয়াছিল। দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উদারতা, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, স্বার্থত্যাগ ও তাঁহার সমুন্নত ধর্ম্ম-জীবন বাস্তবিকই সকলেরই অনুকরণীয়। প্রাচীন বয়সেও তাঁহার কি জলন্ত উৎসাহ।

বক্তৃতা।—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় বার্লিন নগরে গমন করিয়াছেন। তিনি Berlin world Congress of Free christianity and Religious Progress সভায় একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" যিনি ভূমা—মহান্, তিনিই সুখস্বরূপ, ক্ষুদ্র বিষয়ে সুখ নাই।" ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শ্লোক ও মহর্ষির ব্যাখ্যান হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তিনি আপনার বক্তব্য বিষয় বেশ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শোক।—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছি। কোরাণ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েক খানি ধর্ম্মগ্রন্থের বঙ্গ-অনুবাদ তাঁহার নাম স্মরণীয় রাখিবে। তিনি আজীবন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া চলিয়া গেলেন। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন।

বিজ্ঞান-দর্পণ।—শ্রীযুক্ত হারাধন রায় এম, এ, এফ, সি, এস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। ভারতে বিজ্ঞানের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। তাই সম্পাদক বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানতত্ত্ব বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য পত্রিকা খানি বিশেষ যোগ্যতার সহিত লিখিত হইতেছে। ইহাতে অনেক গুলি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ প্রতি মাসেই থাকে। আমরা এই পত্রিকা খানির দীর্ঘজীবন কামনা করি। মধ্যে মধ্যে এই পত্রিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল।

রঙ্গমঞ্চ।—মাসিক পত্রিকা আকারে শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহির করিয়াছেন। মণিলাল বাবু সাহিত্যসেবী। প্রথম খণ্ড খানি নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে; বিষয় নির্ব্বাচন মন্দ হয় নাই। নট নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করা লেখকের উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ আনন্দবিধান ও তৎসঙ্গে শিক্ষাদান করা নাট্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই মহান্ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অভিনয়-কার্য্য সম্পাদিত হইলে জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা পত্রিকা পাঠে আনন্দিত হইলাম। ইহার বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

সামাজিক ব্যাধি।—রেভাঃ চার্লস ভায়সী সাহেব সামাজিক নীতি ও জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে গত ১০ই জুলাই তারিখে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিলাতীয় সমাজের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষার ত্রুটিতে অনেক দোষ সমাজে প্রবেশ করিতেছে। গৃহেও সকল সময়ে সুশিক্ষা প্রদত্ত হয় না। আদালতের সাহায্যে পতিপত্নী বিচ্ছেদের divorce suits আধিক্য গার্হস্থ্য পবিত্রতার পরিচায়ক নহে। ব্যভিচারের মাত্রা প্রতিদিনই বাড়িয়া যাইতেছে। আইন তাহার প্রতীকার করিতে অক্ষম। পুলিশের সাহায্যে ব্যভিচারিণীগণকে নগরের একপ্রান্তে উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শতশত যুবতীকে বিদেশে লইয়া যাওয়া হয়; উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করাইবার জন্য। ভায়েসী সাহেব প্রতিবিধানকল্পে অল্পবয়সে বিবাহ সমাজে প্রবর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন অল্পবয়সে বিবাহে দারিদ্র আসিতে পারে বটে, কিন্তু উহা দুর্নীতি ও দুর্গতি অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেয়স্কর। মদিরা-

সক্তি সামাজিক দুর্নীতির অন্যতম। জুয়াখেলা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। লোকে স্বাস্থ্যজনক ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা ছাড়িয়া আজকাল ঘোড়দৌড়ে গিয়া বাজি ধরিতে সমুৎসুক। আজকালকার দিনে লেখকের লেখনী সংবাদ পত্রে সংযত নহে। সংবাদ-পত্র পাঠে যুবকের হৃদয় অনেক সময়ে সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, ধূর্ত্তামি চালাকী পরনিন্দা ও দলাদলির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে, রাজদ্রোহ ও অসন্তোষের ভাব মনে জাগিয়া উঠে। যাঁহারা রাজনীতির চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যাঁহাদের বক্তৃতায় স্বদেশের সম্মান ও কল্যাণ-রক্ষার জন্য ব্যাকুলতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিলাসের ভাব অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিতেছে।

ভায়েসী সাহেবের এই সকল মূল্যবান ইঙ্গিত যে সত্য-সত্যই ভাবিবার ও চিন্তা করিবার, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮১, বৈশাখ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪২১৲
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩০২১।/৯
সমষ্টি	...	৩৪৪২।/৯
ব্যয়	...	৩২৫৻৩
স্থিত	...	৩১১৭।/৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৫১৭।/৬

৩১১৭।/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ৩২৮৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষিদেবের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয় ২০০৲

একদালীন দান।

শ্রীযুক্ত বনমালী চন্দ্র ১০০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ১০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
,, ,, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, ,, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, ,, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, ,, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	২৲
,, সুহাসিনী দেবী	২৲
,, নীপময়ী দেবী	১৲
,, প্রফুল্লময়ী দেবী	১৲
,, চারুবালা দেবী	১৲
,, লতিকা দেবী	১৲
,, কমলা দেবী	১৲
,, অলকা দেবী	১৲
,, সুকেশী দেবী	১৲
,, ইরাবতী দেবী	১৲
	৩২৮৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৪৸৵০
পুস্তকালয়		৯।৵০
যন্ত্রালয়	...	৩০৲
ব্রঃ সঃ স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৮৸০
সমষ্টি	...	৪২১৲

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭৭৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৪৶৩
পুস্তকালয়	...	১৫৸৶০
যন্ত্রালয়	...	৯০৸৵৬
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		৫।৶৬
ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট	...	১।৵০
সমষ্টি		৩২৫৻৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮১, জ্যৈষ্ঠ।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩২৭৷৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩১১৭৷৵৬
সমষ্টি	...	৩৪৪৪৸৴৬
ব্যয়	...	৩৯৩৷৵০
স্থিত	...	৩০৫১৷৷৵৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৪৫১৷৷৵৬

৩০৫১৷৷৵৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২০০৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায়
২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬৷৵০
পুস্তকালয়	...	১০৷৷৴০
যন্ত্রালয়	...	১০৮৲
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		২৷৷০
সমষ্টি	...	৩২৭৷৷৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২৯৷৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৭৸৶৩
পুস্তকালয়	...	৪৷৴৩
যন্ত্রালয়	...	১০৮৸৶৯
ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট	...	২২৷৷০
সমষ্টি	...	৩৯৩৷৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮১, আষাঢ়।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪২৮৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩০৫১৷৷৵৬
সমষ্টি	...	৩৪৭৯৸৬
ব্যয়	...	৩১৩৷৶৩
স্থিত		৩১৬৬৷৵৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৫৬৬৷৵৩

৩১৬৬৷৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৩০২৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত
২০০৲

একনকালীন দান।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	২৷০
কোম্পানীর কাগজের সুদ	৯৭৴৯
দানাধারে প্রাপ্ত	৪৷৷৵৩
	৩০২৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৷৷০
পুস্তকালয়	...	৪৲
যন্ত্রালয়	...	১২০৷৷৶০
সমষ্টি	...	৪২৮৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭২৸৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮৸৬
পুস্তকালয়	...	১৪৴৬
যন্ত্রালয়	...	৯৭৷৷৵৩
সমষ্টি	...	৩১৩৷৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত পি, চৌধুরী	১০৲
শ্রীযুক্ত নরনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
শ্রীযুক্ত বনমালী চন্দ্র	১৲
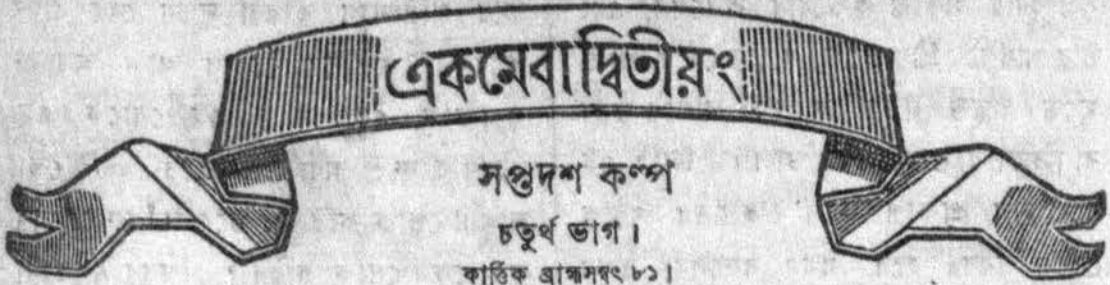
সপ্তদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৮১।

৮০৭ সংখ্যা ১৮৩২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

গীতার প্রশ্ন উত্তর।

(১ম—৬ষ্ঠ অধ্যায়।)

১ প্রঃ। ভগবদ্গীতার উৎপত্তি কি সূত্রে হইল, বল।

১ উঃ। বহু চেষ্টা এবং সাধনার পর দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যখন পাণ্ডবদিগকে পঞ্চ গ্রাম এমন কি সূচ্যগ্র ভূমিও বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিল না, তখন যুদ্ধ আয়োজন হইল। কুরুক্ষেত্রে উভয় সৈন্য যুদ্ধ উদ্যোগ করিয়া সম্মুখীন হইল—উভয় পক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরগণ আপন আপন জয়শঙ্খ শব্দিত করিয়া অগ্রসর হইলেন, অর্জ্জুনের অনুরোধ ক্রমে তাঁহার সারথী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রথ কুরুসৈন্যের সম্মুখে স্থাপন করিলেন—অর্জ্জুন দেখিলেন তিনি রাজ্যাশায় যাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহ তাঁহার গুরু, কেহ আচার্য্য, কেহ পিতামহ, কেহ শ্যালক, কেহ শ্বশুর, কেহ ভ্রাতা, কেহ পূজ্য সম্মাননীয়, কেহবা একান্ত স্নেহপাত্র। তিনি বলিলেন এই আত্মীয়বর্গকে বধ করিয়া রাজ্যলাভ দূরের কথা, জীবন পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করি না—কেমন করিয়া ইহাদিগকে বাণবিদ্ধ করিয়া বধ করিব। হে কৃষ্ণ! আমি রাজ্য-ধন চাহি না—আমি যুদ্ধ করিব না। এই কথা বলিয়া অস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুন যুদ্ধবিমুখ হইয়া বিষণ্ণ মনে অবসাদগ্রস্ত দুর্ব্বলের ন্যায় রথপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ক্ষত্রিয় নিত্যজয়ী পার্থের এই মোহবিহ্বলতা দূর করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। জ্ঞান, কর্ম্ম, ধর্ম্ম সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝাইলেন যুদ্ধ করাই তাঁহার উচিত, যুদ্ধবিমুখ হইলে তাঁহার ইহ-পরলোক নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইবে। নারায়ণের উপদেশে অর্জ্জুনের চিত্তদুর্ব্বলতা দূর হইয়া গেল, তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

১ উঃ। দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা অন্যায় পূর্ব্বক পাণ্ডবদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। সেই রাজ্য ফিরে নেবার জন্য পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করা স্থির করলে পর কুরুক্ষেত্রে দুই পক্ষের সৈন্য সম্মুখীন হয়। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলকে প্রতিপক্ষে দেখে অর্জ্জুন যুদ্ধে তাঁদের হত্যা

সম্ভাবনায় অত্যন্ত কষ্টবোধ করলেন, এবং তাঁর সারথী শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন যে এ পাপ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা আমার মৃত্যু বা ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন ভাল। তিনি এই মনোভাব প্রকাশ করে' হাতের ধনুক ফেলে বিষণ্ণ হয়ে যখন বসলেন, তখন ভগবান তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্য যে সকল গভীর ও মধুর ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ দিলেন, তারই নাম জগদ্বিখ্যাত ভগবদ্গীতা। নবীন সেন বলেন গীতার অভিনেতা অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, স্থান কুরুক্ষেত্র, দর্শক সমবেত নৃপতিমণ্ডলী। ধৃতরাষ্ট্র নিজে এই যুদ্ধ-ব্যাপার দেখ্‌তে অনিচ্ছুক হওয়ায় ব্যাসদেব সঞ্জয়কে নানা প্রকার বিশেষ ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক তাকে অন্ধ বৃদ্ধ রাজার কাছে সেই যুদ্ধ বর্ণনা করবার অনুমতি করলেন, সুতরাং সঞ্জয়ের মুখেই ভগবদ্গীতা আদ্যো-পান্ত ব্যক্ত হয়।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

২ প্রঃ। মৃতের জন্য শোক করা উচিত নয়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কিরূপে বুঝাইলেন?

২ উঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আত্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য প্রথম বুঝাইয়া দিলেন মৃতের জন্য শোক করা ধীমান ব্যক্তির যোগ্য নয়, কেন না আত্মা জন্ম-মৃত্যু রহিত। মৃত্যু বিনাশ নয়, তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্তি। আমরা শৈশব অতিক্রম করিয়া যখন যৌবনে প্রবেশ করি এবং যৌবনান্তে যখন জরাগ্রস্ত হই, তখন তো শোক করি না। তবে মৃত্যুর জন্য কেন শোক করিব, তাহাও অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র; আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সত্য, তাহার ধর্ম্ম মরণশীলতা; কিন্তু দেহের যথার্থ কর্ত্তা যে আত্মা তিনি জন্ম-মৃত্যু রহিত, অবি-নাশী, অক্ষয় এবং নিত্য। যখন দেহের মৃত্যু হয়, তখন দেহস্বামী আত্মা তাহা জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন জীবের আদি অব্যক্ত অপ্রকাশ, কেবলমাত্র এই লোকে এই জীবন ব্যক্ত। অব্যক্ত আদির জন্য তো আমরা শোক করি না, তবে অব্যক্ত শেষের জন্য কেন শোক করিব? স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানী ব্যক্তি এরূপ অবৈধ শোকে অভিভূত হয়েন না। জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, যাহা নিশ্চিত তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়। ইহা ভিন্ন যাঁহারা আজ আছেন, তাঁ-হারা যে পূর্ব্বে ছিলেন না—এমন নয় এবং যাঁহারা আজ নাই, তাঁহারা যে আবার ভবি-ষ্যতে আসিবেন না, এমনও নয়। যেমন জন্মিলে মৃত্যু নিশ্চিত, তেমনি মৃতের জন্মা-ন্তর প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। নিম্ন লিখিত কয়েকটি শ্লোকে ভগবান অর্জ্জুনকে মৃত্যু কেন অশোচ্য তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

১। দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।

২। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

৩। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

৪। অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।

প্রিয়ম্বদা।

২উঃ। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন মৃতের জন্য শোক অনুচিত, কারণ (ক) আত্মা অবি-নাশী, শরীরের অন্তে তার অন্ত হয় না। (খ) যদি মনে কর আত্মা নিত্য মরে ও নিত্য জন্মায়, তাহলেও অপরিহার্য্য অনিবার্য্য ঘট-নার জন্য শোক অনুচিত। তা' ছাড়া জীবের মধ্য-অবস্থা শুধু আমরা ব্যক্ত দেখ্‌তে পাই, তার আদি অব্যক্ত অবস্থার

জন্য যখন দুঃখ করিনা, তখন অন্তের অব্যক্ত অবস্থার জন্যই বা দুঃখ করিব কেন? (গ) এ স্থলে অর্জ্জুনকে বিশেষরূপে, আরও বোঝালেন যে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করাই ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম পালন করা উচিৎ, তা'তে সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি যাই হোক্।

ইন্দিরা।

৩ প্রঃ। গীতার কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা কর। কি কি ভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের বন্ধন-দোষ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, গীতার বাক্যে দেখাও। নৈষ্কর্ম্ম লাভের অধিকার কখন হয়?

৩ উঃ। শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া বুঝাইলেন, আত্মজ্ঞানী তত্ত্ববিৎ কর্ম্মপরাঙ্মুখ হইবে না, (১) কেন না কর্ম্মসাধন ভিন্ন মনুষ্য তিলমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না, কেন না আমাদের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলেও আমাদের কর্ম্ম করিতে হয়। তবে ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। (২) কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।

(৩) ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করিবে, কেন না তদ্ভিন্ন কাম্য কর্ম্মই মুক্তিপথ রোধ করে—(৪) যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে—অর্থাৎ আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্মফলে স্পৃহা-বর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, তাহাই কুশল কর্ম্ম, কেন না সে কর্ম্ম আমাদিগকে বন্ধন করিতে পারে না। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

আসক্তি বিনাশের হেতু আসক্তি রহিত হইয়া কার্য্য করিবে, কেন না

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

গীতা জ্ঞানবাদী, তাই কাম্য-কর্ম্মের প্রতি বিরোধী, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের একেবারে বিরোধী নহেন। গীতা বলেন দেবতাদিগের প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞ করিলে তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে নিয়ত যে উপকার লাভ করিতেছি তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান হয় এবং কতক প্রতিদান করা হয়। কেন না কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য আমরা যাহা ভোগ করিয়া থাকি, দেবতা প্রীতির জন্য করি না, তাহা অতি নিকৃষ্ট ভোগ—পশুযোগ্য। যজ্ঞসাধন দ্বারা পরমেশ্বরেরও প্রীতি সাধন করা হয়, কেননা—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ
যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞকর্ম্মসমুদ্ভবঃ
যজ্ঞং ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং।

(৫) লোক সংগ্রহের জন্যও কর্ম্ম করা আবশ্যক, কেন না মহৎগণ যাহা করেন প্রাকৃত লোক তাহারি অনুসরণ করিয়া থাকে। জনকাদি রাজর্ষিগণ যদিও আত্মজ্ঞানী এবং মুক্তপুরুষ ছিলেন, তবুও তাঁহারা চিরজীবন লৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ত্রুটি করেন নাই।

(৬) যাঁহার যে ধর্ম্ম তাঁহার তাহারি অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য, কেন না তাহা না হইলে সামাজিক শৃঙ্খলা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ভগবান বলিতেছেন চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য এবং তাহা না করিলে অধর্ম্ম হয়। ভগবান বলিতেছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধ-ত্যাগ করিয়া যে ব্রাহ্মণোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে পাপ-চেষ্টাস্বরূপ।

যিনি কর্ম্মফল প্রত্যাশা না করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তিনি সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্ম-ত্যাগের অধিকারী

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিঃ নচাক্রিয়ঃ।

আত্মজ্ঞানলব্ধ, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি নৈষ্কর্ম্মের অধিকারী; কর্ম্মের দ্বারা যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে—সাংখ্য মতে যিনি কৈবল্য স্বরূপে অবস্থিত এবং গীতার মতে যিনি পরব্রহ্মের সহিত যোগ-যুক্ত, তাঁহার করণীয় আর কিছুই থাকে না। যিনি তত্ত্বজ্ঞানী নহেন, যাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হয় নাই, তিনি কখনই নৈষ্কর্ম্মের অধিকার লাভ করেন না—তাঁহার কর্ম্ম-বিমুখতা তামসিক জড়তা মাত্র।

প্রিয়ম্বদা।

৩উঃ। এক হিসাবে গীতার মুখ্য কথাই কর্ম্মযোগ, কারণ অর্জ্জুনকে কর্ম্মে বা ধর্ম্মপ্রবৃত্ত করাই গীতার উদ্দেশ্য। যদিও জ্ঞানীকে এবং জ্ঞানযোগকে খুব উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে পুনঃপুনঃ বলা হয়েছে যে কর্ম্মসোপান দিয়ে তবে জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিতে হবে, একেবারে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া যায় না। তবে কর্ম্ম করিতে হবে কিরূপে? না (ক) ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে, নিষ্কামভাবে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমং ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

(খ) আমি কর্ত্তা নই, প্রকৃতির গুণবশতঃ ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে নিযুক্ত রয়েছে, এই মনে করে'—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

(গ) সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করে'।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি যুক্ত আসীত মৎপরঃ

এই প্রকারে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের বন্ধনকারী দোষ হতে মুক্ত হওয়া যায়। কর্ম্ম করতেই হবে, তুমি চাও বা না চাও; কারণ কেউ সম্পূর্ণ নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে' থাকতে পারে না। শরীর-যাত্রা পর্য্যন্ত কর্ম্ম না করলে চলে না। তবে উপরি-উক্ত ভাবে করলে কর্ম্ম মুক্তির অন্তরায় না হয়ে বরং সহায় এবং উপায় হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্ম তার সোপান। যে যোগ-পথের পথিক, কর্ম্মই তার অবলম্বন। তবে যে যোগসিদ্ধ হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেছে, গন্তব্য স্থানে পৌঁচেছে, একমাত্র সেই ব্যক্তি নৈষ্কর্ম্মের অধিকারী।

ইন্দিরা।

৪ প্রঃ। ভগবান স্বীয় কর্ত্তব্যসাধন বিষয়ে কি বলিতেছেন?

৪ উঃ। অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে দিতে স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্
প্রকৃতিং স্বাং অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া—

যদি ও আমি অক্ষর নিত্য ও অনাদি এবং সর্ব্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট, তবুও আত্ম-মায়ার দ্বারা আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। যদিও এ বিশ্বে আমার আকাঙ্ক্ষণীয় কিম্বা অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, তবুও সাধারণ মানবের ন্যায় আমিও কর্ত্তব্যের নিয়ত বশবর্ত্তী। এবং যে সময়ে অধর্ম্মের অভ্যু-

ত্থান ও ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, হে ভারত! তখন আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

সাধুদিগের পরিত্রাণ—পাপকারীদিগের বিনাশ সাধন এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত—যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

প্রিয়ম্বদা।

৪উঃ। কর্ম্ম সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে গীতার আর এক যুক্তি এই যে মহতে যা' করে ইতরলোকে তারই অনুকরণ করে, অতএব লোকরক্ষা ও সৎদৃষ্টান্তের অনুরোধে কর্ম্মত্যাগ করা অনুচিত। এই সূত্রে ভগবান বলেন যে তাঁরও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তু অপ্রাপ্য নাই, কোন বিষয়ে আসক্তি নাই, কোন কাজ করবার আবশ্যকতা নাই, তবুও তিনি সর্ব্বদা কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত, নইলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, বিশ্বে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

ইন্দিরা।

৫প্রঃ। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবাদ বিষয়ক শ্লোকগুলি অন্বয় করিয়া ব্যাখ্যা কর, (২।৪২-৪৫)

৫ উঃ।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ
বেদবাদরতাঃ পার্থ, নানাদস্তীতিবাদিনঃ
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাঃ
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

হে পার্থ, বেদবাদরতা অন্যংনাস্তি ইতি বাদিনঃ কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ যে অবিপশ্চিতঃ যামিমাং জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

হে পার্থ পৃথানন্দন, বেদবাদরতাঃ বেদবাদপরায়ণাঃ অন্যংনাস্তি বেদাদৃতে অন্যংনাস্তি বাদিনঃ ইতি কথকাঃ কামাত্মানঃ ভোগানুরক্তাঃ স্বর্গপরাঃ স্বর্গাভিলাষিণঃ যে অবিপশ্চিতঃ অপণ্ডিতাঃ তত্ত্বজ্ঞানবিরহিতা জনাঃ যাং ইমাং জন্ম পুনর্জন্ম কর্ম্মফলক প্রকর্ষেণ দদাতীতি তাং, ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি বিষয়ানুরাগ ধনরত্নলাভং প্রতি তদুদ্দেশে ক্রিয়মানং ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং বহু যাগ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ণাং পুষ্পিতাং বিবলতাদিবৎ আপাতরমণীয়াং বাচং কথাং প্রবদন্তি বিশেষেণ কথয়ন্তি ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং বিষয়মুগ্ধচিত্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং ক্রিয়াবিশেষ বহুলয়া হৃত-চেতসাং লুপ্ত হৃদয়ানাং তেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ বিষয়মুগ্ধা চিত্তবৃত্তিঃ সমাধৌ নির্বীজধ্যানে ন বিধীয়তে ন সম্যক্ কার্য্যকরী ভবতি।

হে পার্থ। বেদানুমোদিত বাক্যের প্রশংসাকারী, এবং ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই যাহারা বলিয়া থাকে, যাহারা বিষয়মুগ্ধ এবং স্বর্গাভিলাষী, যাহারা তত্ত্বজ্ঞান রহিত, যাহারা জন্মকর্ম্মপ্রদানক্রিয়াপূর্ণ যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী, যাহারা আপাতরমণীয় বাক্য সকল বলিয়া থাকে, যাহাদের চিত্ত ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে অনুরক্ত, যাহারা যাগ-যজ্ঞের কার্য্য বহুলতায় মুগ্ধ, তাহাদের বিষয়-বিমোহিত চিত্তবৃত্তি সমাধি অর্থাৎ নির্বীজ ধ্যানের উপযোগী হয় না॥

প্রিয়ম্বদা।

৫উঃ।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিংপ্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

হে পার্থ, অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং জন্মকর্ম্মফলপ্রদং ভোগৈশ্বর্য্যগতিংপ্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং বাচং প্রবদন্তি তয়াপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

অর্থাৎ ;—হে পার্থ, বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে যারা সারধর্ম্ম মনে করে, এবং তা' ছাড়া আর কিছু নাই ভাবে, এমন

যে সব সকাম স্বর্গসুখলোভী মূর্খ, তারা যে সকল আপাতমনোরম ললিত কথায় পরজন্মে সুকৃতির ও সুফলের আশা দেয়, নানাপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে উপদেশ দেয়, এবং ভোগ ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখায়, সেই সকল মিষ্টবাক্যে ভোগাসক্ত ব্যক্তিরাই ভোলে। তাদের শুভবুদ্ধি কখনই সমাধিতে স্থির হয় না।

ইন্দিরা।

৬প্রঃ।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

এই শ্লোক ব্যাখ্যা কর।

৬উঃ।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ, বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ।
পরিপ্লাবিতে মহাসমুদ্রে সন্নিকটে সতি উদপানে বাপী কূপাদি ক্ষুদ্রে জলাশয়ে যাবানর্থঃ যাবৎ প্রয়োজনং ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিতি তাবৎ বিজানতঃ সম্যক্ জ্ঞানশীলস্য প্রজ্ঞারত ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ সর্ব্বেষু বেদেষু শাস্ত্রেষু তাবানর্থঃ প্রয়োজনমিতি শেষঃ।

পরিপ্লাবিত মহাসমুদ্র নিকটে থাকিলে বাপী কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের যেমন কোনই প্রয়োজন থাকেনা, ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট তেমনই বেদ বাক্যের ও শাস্ত্র-প্রমাণের কোনই প্রয়োজন থাকে না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাহার নিকট সৃজন সৃষ্টি এবং সৃজনকারের সকল গূঢ় রহস্য প্রকাশিত—যাহার হৃদয় সেই পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত, তাহার বেদ কিম্বা শাস্ত্র কিছুরই আবশ্যক নাই। তিনি সকল লৌকিক বিধি-বিধান সকল কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান সকল প্রশ্ন সকল মীমাংসার অতীত হইয়া যান। সমগ্র যাঁহার নিকট ব্যক্ত প্রকাশিত, তাঁহার আর ক্ষুদ্র অংশ সকলের প্রয়োজন থাকে না।

প্রিয়ম্বদা।

৬উঃ।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবান্ অর্থঃ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবান্ (অর্থঃ)।

অর্থাৎ কি না সব স্থান যখন জলে ভেসে গিয়েছে, তখন উদপান বা ক্ষুদ্র জলাশয় যেমন অনাবশ্যক, যে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, তার পক্ষে বেদ সকলও তেমনি অনাবশ্যক। যখন হাতের কাছে সর্ব্বত্রই জল পাওয়া যায়, তখন কূপ তড়াগাদিতে যাবার আবশ্যক কি? তেমনি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার যোগ হয়, তাঁকে আত্মায় পাওয়া যায়, তখন শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁকে খুঁজ্‌তে যাবার আবশ্যক কি?

ইন্দিরা।

৭ প্রঃ।

:কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা এই বাক্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা কর।

৭ উঃ। কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখার এক অর্থ, সকল মানুষিক ভাল কাজের মধ্যেও একটু মন্দ এবং মন্দ কাজের মধ্যেও একটু ভাল থাকে, সেইটে বুঝ্‌তে পারা। আর এক অর্থ, কর্ম্মের যে দোষ বন্ধনকারিতা, সেটা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, যদি নিষ্কাম কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞানশূন্য ভাবে করা যায় এবং ঈশ্বরে সমর্পণ করা যায়। তাহলে সেই ভাবের নির্দ্দোষ কর্ম্মকে অকর্ম্ম বল্লেও চলে, কারণ কর্ম্মের দোষই যদি স্পর্শ না করে ত কর্ম্মে অকর্ম্মে প্রভেদ কি? আর অকর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ যদি করি, তাহ'লে সেই কর্ত্তব্য ত্রুটি-জনিত ফলভাগী আমাকে হ'তে হবে। অতএব কর্ম্মফল ভোগী হ'লে আর কর্ম্মের বাকি রইল কি? সুতরাং এ স্থলে কর্ম্ম না করেও কর্ম্মদোষ স্পর্শ করায় অকর্ম্মও কর্ম্মের সমান হয়ে পড়ল। সংক্ষেপে কর্ম্মের বন্ধনকারীতাই কর্ম্ম নাম বাচ্য, সেইটে থাক্‌লে অকর্ম্মও কর্ম্মরূপ

স্মরণ করে। এবং সেটা এড়াতে পারলে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের সামিল হয়। এই কর্ম্ম-কৌশলই যোগ—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।

ইন্দিরা।

৮প্রঃ। আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে শ্লোকগুলি বল। (মূল ও অর্থ)

৮উঃ।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা,
তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি।

দেহিনঃ শরীরিনঃ অস্মিন্ দেহে শরীরে কলেবরে চ যথা কৌমারং শৈশবং যৌবনং প্রাপ্তবয়ঃ জরা বার্দ্ধক্যং চ একঃ অন্যং অনুসরতি তথা তদ্রূপং দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ভিন্নদেহগ্রহণং মৃত্যুরিতি যাবৎ ধীরঃ পণ্ডিতঃ জনঃ তত্র ন মুহ্যতি নানুশোচতি।

আমাদিগের এই শরীরে শৈশব যেমন যৌবনে, এবং যৌবন যেমন বার্দ্ধক্যে পরিণত হয়ে অবস্থার তারতম্য উপস্থিত করে—মৃত্যুও তেমনি এই ভৌতিক দেহের অবস্থান্তর মাত্র, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে বিচলিত কিম্বা কাতর হয়েন না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজোনিত্যঃ শাশতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

অয়ং আত্মা ন জায়তে কদাচিৎ ন ম্রিয়তে বা নভূত্বা ভূয়ঃ ন ভবিতা, অজঃ নিত্যঃ শাশতঃ পুরাণঃ শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে।

অয়ং আত্মা কদাচিৎ ন জায়তে, ন ম্রিয়তে ন মৃতঃ ভবতি; ভূত্বা অয়ং ভূয়ঃ পুনরপি ন ভবিতা ন, অয়ং অজঃ জন্ম রহিতঃ নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়ঃ শাশ্বতঃ নিত্যৈকভাবঃ পুরাণঃ পুরাতনঃ চিরন্তনোঽপি শরীরে অস্মিন্ দেহে হন্যমানে ঘাতিতে সতি ন হন্যতে।

এই আত্মা জন্ম মৃত্যু রহিত, একবার হইয়া আর না হইবার নয়, ইহা আদিহীন, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় এবং চিরন্তন, হত হইলেও ইহার বিনাশ নাই।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় নরঃ যথা নবানি অপরানি গৃহ্নাতি, দেহী তথা জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি সংযাতি। জীর্ণানি গলিতানি বাসাংসি বিহায় পরিত্যজ্য নরঃ মানবঃ যথা অপরাণি নূতনানি গৃহ্নাতি দেহী শরীরিতয়া জীর্ণানি জরাগ্রস্তাণি দেহানি ত্যক্ত্বা অন্যানি অপরাণি নূতনানি সংযাতি।

জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমরা যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকি, তেমনি জরাগ্রস্ত গলিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহী আবার নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত,
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা?

হে ভারত ভরতকুলর্ষভ, ভূতানি অব্যক্তাদীনি অপ্রকাশিতপূর্ব্বাণি ব্যক্তমধ্যানি দৃষ্টিগোচরাণি প্রত্যক্ষীকৃতানি মধ্যানি, অব্যক্তনিধনানি অপ্রকাশিতানি নিধনানি বিনাশানি যেষাং অপ্রকাশিতনিধনানি তত্র তস্মিন্ বিষয়ে কা পরিদেবনা কা অনুশোচনা—কঃ শোকঃ?

হে ভারত ভরতকুলচূড়া, জীব সকলের জন্মপূর্ব্বকাল অব্যক্ত, তাহার বিচার আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি—তাহাদের মধ্যকাল অর্থাৎ ইহজীবন ব্যক্ত, আমাদিগের জ্ঞানগোচর, তাহাদিগের নিধন শেষ-কাল আমাদের জ্ঞানের অতীত—তাহার জন্য কেন শোক করিবে? অব্যক্ত জন্মপূর্ব্ব কালের জন্য বিলাপ কিম্বা যদি শোক না করি, তবে অজ্ঞাত মৃত্যুপরকালের জন্য কেন অনুশোচনা করিব?

প্রিয়ম্বদা

৮উঃ।

দেহিনোস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

মনুষ্যদেহে যেমন পর পর কৈশোর যৌবন ও বার্দ্ধক্য দেখা দেয়, মৃত্যুও তদ্রূপ একটা অবস্থান্তর মাত্র। ধীরব্যক্তি তজ্জন্য শোক করেন না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

আত্মার জন্ম বা মৃত্যু কখনো নাই, একবার হয়ে যে আবার হবে তাও নয়। এই আত্মা জন্মরহিত, অনন্ত, বিকার শূন্য এবং সনাতন, শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে তার বিনাশ হয় না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি॥
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় ছেড়ে ফেলে অন্য নূতন কাপড় পরে, তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে' দেহী অপর নূতন শরীর ধারণ করে।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি, ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

জীব আদিতে অব্যক্ত, হে ভারত, মধ্যে ব্যক্ত, আবার অন্তকালে অব্যক্ত, তার জন্য দুঃখ কি?

ইন্দিরা।

৯প্রঃ।

যজ্ঞ বিধান বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের ৭টি শ্লোক (১০-১৬) সম্বন্ধে কি বক্তব্য?

৯উঃ। গীতা যদিও জ্ঞানবাদী, তবুও কর্ম্ম-সন্যাস তাহার অনুমোদিত নহে, কাম্য-কর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। দেবতা-প্রীতির জন্য যে যজ্ঞ তাহা গীতানুমোদিত। গীতার লক্ষ্য জ্ঞান, তাহা লাভের সোপান কর্ম্ম। পঞ্চ যজ্ঞাদি সাধন কর্ত্তব্য, কেননা তাহাতে লৌকিক সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, দেবতাপ্রীতি এবং জীবলোকের উপকার সাধিত হয়। অন্ন হইতে জীবলোকের সৃষ্টি, মেঘ হইতে অন্নের সৃষ্টি এবং যজ্ঞ হইতে মেঘের সৃষ্টি হয়। অতএব এক যজ্ঞ সাধন দ্বারা সর্ব্বলোকের উপকার সাধিত হয়। যজ্ঞের উৎপত্তি বেদ হইতে এবং বেদের উৎপত্তি সেই অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে, যজ্ঞেই পরব্রহ্ম নিত্য অধিষ্ঠিত। তবে কাম্যফল বাসনা করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাই আমাদিগকে বন্ধন করে। ঈশ্বরোদ্দেশে যে যজ্ঞ সাধিত হয় তাহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এক শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন যজ্ঞের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ না করিয়া যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই মুক্তিপথরোধী, সেই নিমিত্ত সকল কর্ম্মই তাঁহার উদ্দেশে করিবে। এখানে যজ্ঞের অর্থ লৌকিক অনুষ্ঠান নহে, এখানে যজ্ঞের অর্থ বিষ্ণু কিম্বা ভগবান। সকল কর্ম্ম করিতে হইবে কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশে করিতে হইবে। গীতা বলিতেছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে যজ্ঞেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত যজ্ঞ অবশ্য অনুষ্ঠেয়। যজ্ঞকালে যজমান দেবতাদিগকে প্রীতির সহিত স্মরণ করেন, তাঁহারাও ভক্তিমানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন ইহাতে তাহার ইহপারলৌকিক শ্রীবৃদ্ধি হয়।

প্রিয়ম্বদা।

৯ উঃ। "সহযজ্ঞাঃ প্রজা সৃষ্টাঃ" প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞ সম্বন্ধীয় শ্লোক বঙ্কিম বাবুর মতে প্রক্ষিপ্ত। গীতার ভাষা ও ভাবে সর্ব্বত্র যে উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে, এই শ্লোকগুলি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরণের। সুতরাং উক্ত মত অসঙ্গত মনে হয় না।

ইন্দিরা।

১০প্রঃ।

কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ? অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের সহিত পূর্ব্বাপর কি সম্বন্ধ? প্রশ্নটির উত্তর দাও (মূল অর্থ সহিত)

১০উঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগের উপদেশ দিলে অর্জ্জুন বলিলেন অনিচ্ছা সত্বেও মনুষ্য কেন পাপাচরণ করে? কেন তাহার মনে হয় আর কেহ যেন বল

পূর্ব্বক তাহাকে পাপানুষ্ঠানে রত করিতেছে—এই শক্তিশালী শত্রু কে? শ্রীভগবান বলিলেন

কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং।

এই কাম অর্থাৎ কামনা দুষ্পূর, ইহার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, ইহা সর্ব্বভূক, জীবনের সকল স্ফূর্ত্তি, সকল চেষ্টা নষ্ট করিয়া দেয়, ইহা সর্ব্ব দোষের আকর।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

প্রিয়ম্বদা।

১০ উঃ। শ্রীকৃষ্ট বলিলেন কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম এই সকলের প্রভেদ বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। যখন যখন মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান লোপ পায়, তখন তখন আমি জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শিক্ষা দিই। মানুষ স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া কিছুই করে না, ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব গুণ অনুসারে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। ফলকামনাশূন্য হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তাহাতে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন তবে কে আমাদের যেন বলপূর্ব্বক অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়? ভগবান তদুত্তরে বলিলেন "কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ"। অগ্নি যেমন ধূমে আবৃত, গর্ভ যেমন জরায়ু দ্বারা আবৃত, তেমনি মনুষ্যবুদ্ধি এই দুর্দ্দান্ত রিপু দ্বারা মোহাচ্ছন্ন। ইহা "দুষ্পূর অনলের" ন্যায়, কিছুতেই ইহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। এই দুর্দ্ধর্ষ রিপুকে সংযম অভ্যাসের দ্বারা জয় করিতে পারিলে তবে মোক্ষপথ পরিষ্কার হয়। মানুষের মন বুদ্ধি ও দেহ ইহার অধিষ্ঠান ভূমি।

ইন্দিরা।

১১ প্রঃ।

গীতোপদিষ্ট জ্ঞান কাহাকে বলা যায়? কোন্ সাধক সে জ্ঞান লাভ করেন? গীতার আদর্শ-জ্ঞানী স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি?

১১ উঃ। গীতোপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান পরাবিদ্যা অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা সেই অবিনাশী অক্ষর ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়—তবে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হয়, নিম্ন লিখিত শ্লোকগুলি হইতে গীতার উপদেশ সুস্পষ্ট হয়—

আরুরুক্ষোঃ মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণ মুচ্যতে
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে॥

যে মুনি যোগ লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কর্ম্মই তাঁহার আরোহণ পদবী, আর যিনি যোগস্থ শম তাঁহার আশ্রয়।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।

জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র ইহসংসারে আর কিছুই নাই, তাহা হইতে যোগসিদ্ধ হইয়া মানব কালে আপনাকেই প্রাপ্ত হয়।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্
আত্মন্যেবা হ্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদুচ্যতে।

হে পার্থ! সাধক যখন মনোগত সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ, জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

হে শত্রুজয়ী, দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কেন না অখিল কর্ম্মসমূহ জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন,
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে

ভস্মসাৎ করে, হে অর্জ্জুন! জ্ঞানাগ্নি তেমনি সর্ব্ব কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিং অচিরেনাধিগচ্ছতি।

যিনি শ্রদ্ধাবান এবং ঈশ্বরে ভক্তিপরায়ণ, তিনিই জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং পরম জ্ঞান লাভ করিলেই অপার নিত্য শান্তির অধিকারী হয়েন। যিনি শ্রদ্ধাবান, বিশ্বাসী, যিনি তৎপর অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তিপরায়ণ তিনি এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের অধিকারী হয়েন।

গীতায় নিম্ন লিখিত কয়েকটি শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞ আদর্শ-জ্ঞানীর লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।

হে পার্থ! যিনি মনোগত বাসনা সকল ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট, তিনি আদর্শ জ্ঞানী তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।

যিনি দুঃখে অবিচলিত, সুখে স্পৃহাশূন্য, যিনি বাসনা ভয় এবং ক্রোধ বর্জ্জিত, তিনি স্থিরবুদ্ধি মুনি বলিয়া কথিত হয়েন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিতা।

যখন সাধক কূর্ম্মের অঙ্গের ন্যায় আপনার মধ্যে আপন সকল বাসনা সংহরণ করিয়া লয়েন, ইন্দ্রিয় প্রয়োজনীয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলও সংহরণ করেন, তখনি তাঁহার প্রজ্ঞা লাভ হয়।

প্রিয়ম্বদা।

১২ উঃ। গীতোপদিষ্ট জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, আত্মায় পরমাত্মজ্ঞান, এক কথায় ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান। শুধু শুষ্ক শাস্ত্রসম্মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নহে, কিন্তু ভক্তিরসপূর্ণ আনন্দময় জ্ঞান, যাহা সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত হইলে জীবব্রহ্মে অভেদভাব হয়, সর্ব্বভূতে তাঁহাকে ও তাঁহাতে সর্ব্বভূত উপলব্ধি হয়, এবং অবশেষে ব্রহ্মে যোগজনিত ভূমানন্দ লাভ হয়।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"।

যিনি শ্রদ্ধাভক্তিপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, এবং ঈশ্বর মাত্র যাঁহার ধ্যান জ্ঞান, এই প্রকার সাধকই যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ। গীতার আদর্শ জ্ঞানী বা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ এই:—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতঃ প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহ স্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

অর্থাৎ যিনি সকল কামনা বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট, যিনি দুঃখে কাতর এবং সুখে আসক্ত নহেন, যাঁহার অনুরাগ রাগ বা ভয় নাই, যিনি মায়া মমতা শূন্য এবং সাংসারিক লাভ ক্ষতিতে যাঁহার হর্ষও নাই বিষাদও নাই, যিনি কূর্ম্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংহরণ করেন বা সংযতভাবে ইন্দ্রিয়কার্য্য করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

ইন্দিরা।

(ক্রমশঃ)

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, মঙ্গল।

(পঞ্চম উপদেশের অনুবৃত্তি)

দণ্ড ও অপরাধের মধ্যে ঠিক্ অনুপাতটি কি? এই প্রশ্নের একটা সম্পূর্ণ মীমাংসা হইতে পারে না। ইহার মধ্যে

যেটুকু ধ্রুব ও অপরিবর্তনীয় তাহা এই— যাহা ন্যায়-বিরুদ্ধ তাহাই দণ্ডনীয়, এবং অন্যায় যতই গুরুতর হইবে, তাহার দণ্ডও সেই পরিমাণে কঠোর হওয়া উচিত। কিন্তু দণ্ডবিধানের অধিকারের পাশাপাশি, অপরাধ-সংশোধনের একটা কর্তব্যও আছে। অপরাধীকে দোষ-সংশোধনের একটা অবসর দেওয়া উচিত। মানুষ যতই অপরাধী হউক না, তবু সে মানুষ; মানুষ ত একটা জিনিস নহে যে তাহার দ্বারা কিছু-মাত্র আমাদের হানি হইলেই আমরা তাহাকে সরাইয়া ফেলিব। আমাদের মাথায় একটা পাথর পড়িলে আমরা তা-হাকে দূরে নিঃক্ষেপ করি, পাছে উহা আর কাহাকে আঘাত করে। মনুষ্য বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব, মানুষ ভাল মন্দ বুঝিতে পারে, কোন-না-কোন দিন তার অনুতাপ হইতে পারে, আবার সুপথে ফিরিয়া আসিতে পারে। এই সকল তত্ত্ব হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে এমন কতকগুলি সদনু-ষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, যাহাতে করিয়া ঐ দুই শতাব্দী বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে। সংশোধনালয়ের কথা উল্লেখ করিতে গেলে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রারম্ভকাল মনে পড়িয়া যায়। তখন দণ্ড প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ছিল। অপ-রাধীরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, অনুতাপ করিয়া আবার সাধুর শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত। এই স্থলে, উদার মৈত্রীর হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়; এই মৈত্রীতত্ত্ব ন্যায়তত্ত্ব হইতে অনেকটা ভিন্ন। দণ্ড-বিধান করা ন্যায়ের কাজ, দোষসংশোধন করা মৈত্রীর কাজ। কিরূপ পরিমাণে এই দুই তত্ত্বকে সম্মিলিত করা বিধেয়?— ইহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন—অতীব সূক্ষ্মবিচার-সাপেক্ষ। তবে, এইটুকু নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে, ঐ দুই তত্ত্বের মধ্যে ন্যায়েরই প্রাধান্য থাকা উচিত। অপরাধীকে সংশোধন করিবার সময় অনেক সময় রাজসরকার, ধর্ম্মের অধিকারকে দখল করিয়া বসেন। কিন্তু রাজ সরকারের যাহা বিশেষ কাজ, যাহা নিজস্ব কর্তব্য—রাজসরকার যেন তাহা বিস্মৃত না হন।

যাহাকে প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি বলে, এখন সেই রাষ্ট্রনীতির প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া একটু থামা যাক্। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বগুলি ছাড়া আর কিছুই ধ্রুব নহে, কিছুই অপরিবর্ত্তনীয় নহে, বাকি আর সমস্তই আপেক্ষিক। জনসাধারণের কতকগুলি দুর্লঙ্ঘ্য অধি-কারকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করাই রাজ-শক্তির কাজ—অতএব অধিকার সংরক্ষণের সংস্রবেই রাজ্যতন্ত্রসমূহের মধ্যে যাহা কিছু ধ্রুবত্ব। কিন্তু রাজ্যতন্ত্রসমূহের একটা আপেক্ষিক দিকও আছে। দেশ কাল পাত্র অনুসারে, আচার ব্যবহার ইতি-হাসের বিশেষত্ব অনুসারে, রাজ্যতন্ত্রের রূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্র, রাষ্ট্র-তন্ত্রকে যে পরম নীতি অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন তাহা এই—সমস্ত অবস্থা সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া, সমাজের এরূপ গঠন ও ব্যবস্থাদি বিধান করা কর্ত্তব্য, যাহাতে, যতটা সম্ভব নিত্য ও ধ্রুবতত্ত্বসমূহের সহিত তাহাদিগের মিল থাকে। সমাজের সেই সকল গঠন, সেই সকল ব্যবস্থাকেও ধ্রুব-নিত্য বলা যাইতে পারে, কেননা উহা কোন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত অনুমান হইতে প্রসূত নহে, পরন্তু উহা অপরিবর্ত্তনীয় মানব-প্রকৃ-তির উপর, হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ প্রবৃত্তি-সমূহের উপর, ন্যায়ের অবিনশ্বর ধারণার উপর, মহোন্নত মৈত্রীভাবের উপর, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধির উপর, কর্ত্তব্য ও

অধিকার বুদ্ধির উপর, পাপপুণ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যাহা প্রকৃত সমাজ, যাহা মানব-সমাজ—এই সুন্দর নামে অভিহিত হইতে পারে, অর্থাৎ যে সমাজ স্বাধীন ও বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের দ্বারা পরিগঠিত,—এই তত্ত্বগুলি ঐরূপ সমাজেরই প্রতিষ্ঠাভূমি। যে-কোন রাজ্যতন্ত্র স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের যোগ্য, যে রাজ্যতন্ত্র ইহা জানে যে, কতকগুলা পশুর সহিত তাহার কারবার নহে পরন্তু বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের সহিত কারবার, যে রাজতন্ত্র মানুষকে সম্মান করে, প্রীতি করে,—উক্ত নীতিসূত্রগুলিই এই প্রকার রাষ্ট্রতন্ত্রকেই পরিচালিত করিয়া থাকে।

ঈশ্বরের কৃপায়,—ফরাসী সমাজ এবং যে রাজবংশ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ফরাসী সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিয়াছে, সেই সমাজ ও সেই রাজবংশ বরাবর ঐ অবিনশ্বর আদর্শের আলোক ধরিয়া চলিয়াছে। (Louis le Gros) রাজা 'মোটা'-লুই, পৌর-সাধারণ-সভাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন; রাজা 'রূপবান'ফিলিপ পার্লেমেণ্ট স্থাপন করেন এবং বিচারালয়ে স্বাধীন বিচার ও বিনামূল্যের বিচার প্রবর্ত্তিত করেন; চতুর্থ হেনরী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতার সূত্রপাত করেন; ত্রয়োদশ লুই ও চতুর্দ্দশ লুই যেমন একদিকে ফ্রান্সের স্বাভাবিক প্রান্তগুলি ফ্রান্সকে প্রদান করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তেমনি ফরাসী জাতির সকল অংশকে একীভূত করিবার জন্য, সামন্ততন্ত্রের অরাজকতার স্থানে, নিয়মিত শাসনকার্য্য প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, মাতৃভূমির সাধারণ হিতের জন্য, বড় বড় সামন্তদিগের অধিকার ক্রমশ খর্ব্ব করিয়া তাহাদিগকে অভিজাতবর্গের শ্রেণীতে আনয়ন করিবার উদ্দেশে অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। একজন ফ্রান্সের রাজাই, দেশে অভিনব অভাব সকল বুঝিতে পারিয়া, তৎকালের সাধারণ উন্নতির সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায়ে, বিশৃঙ্খল ও গঠনহীন প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের স্থানে সভ্যজাতির উপযুক্ত প্রকৃত প্রতিনিধিশাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, নানা কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া লোমহর্ষণ রাষ্ট্রবিপ্লবে পরিণত হয়; কিন্তু সেই গৌরবান্বিত চেষ্টা ব্যর্থ হইত না, যদি সে সময়ে রিশ্‌লিউ কিংবা ম্যাজ্যারঁ্যার মত কোন ব্যক্তি রাজ্যের কর্ণধার থাকিত! সর্ব্বশেষে, ষোড়শ লুইর ভ্রাতা স্বতঃপ্রবর্ত্তিত হইয়া ফ্রান্সকে এমন একটি স্বাধীন ও জনহিতকর শাসনতন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, যাহা আমাদের পিতৃপুরুষদিগের স্বপ্নের বিষয় ছিল, এবং মন্‌টেস্কিউ স্বকীয় গ্রন্থে যাহার আভাস দিয়া গিয়াছিলেন। সেই রাজ্যতন্ত্র অংশত কার্য্যে পরিণত ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া, বর্ত্তমান কালের ও দূর ভবিষ্যৎ কালেরও উপযোগী হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত অধিকারের ঘোষণা-পত্রে সেই সকল বীজ-সূত্রের উল্লেখ আছে যাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। ফ্রান্সের উদ্দেশে ও বিশ্বমানবের উদ্দেশে আমরা যে সকল স্পৃহা ও আশা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকি তৎসমস্তই সেই অধিকার-পত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে।

ধর্ম্মের আদর্শ।

ধর্ম্ম নানাবিধ। ধর্ম্ম বলিতে ভালও বুঝায়, মন্দও বুঝায়। কিন্তু সকল ধর্ম্মেরই একটি মধ্যবিন্দু আছে। সে কি না ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, নিজের বুদ্ধিও বিবেচনা ইহাতে সায় দেয়। ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত ন্যায়

যে পৃথিবীতে জয়যুক্ত হয় ইহাতেও সকলের আস্থা আছে, কিন্তু সকলে তাঁহাকে আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না; তাঁহার সহিত মনুষ্য যে যোগসূত্রে আবদ্ধ একথা সকলের অন্তরে স্থান পায় না। বস্তুতঃ ইহা ধর্ম্মের ভাব নহে। যতক্ষণ না ঈশ্বরকে সত্যবস্তু জানিয়া তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করি, আমাদের চরিত্র ও ব্যবহার তাঁহার অনুগত করি, ততক্ষণ তাহা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মের ভিতরে ভালও থাকিতে পারে, মন্দও থাকিতে পারে, এবং ভাল মন্দ উভয়ই মিশ্রিত থাকিতে পারে। ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিভিন্ন মনুষ্যের বা বিভিন্ন জাতির যে বিভিন্ন ধারণা তাহাই ধর্ম্মের বিভিন্ন মূর্ত্তি। কেহ বা ঈশ্বরকে পরম বন্ধু জানিয়া তাঁহাকে অন্তরের প্রীতি দান করেন, এই খানেই ধর্ম্ম পবিত্রতা ও পরমানন্দের উৎস। কেহ বা ঈশ্বরকে ভয় করে, কেহ বা তাঁহার মঙ্গলভাব অনুভব করিতে পারে না, কেহ বা তাঁহার নামে ভয়ে প্রকম্পিত হয়, এইখানে ধর্ম্ম অশান্তি ও দুর্গতির আলয়।

স্থূলতঃ ধরিতে হইলে ধর্ম্ম দুই প্রকারের, এক প্রেমের ধর্ম্ম, অন্য ভয়ের ধর্ম্ম। ভয়ের ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রেমের ধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠতর, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সকল ধর্ম্মেরই ভিতরে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচিত হয়। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যার যেরূপ ধারণা, তাহার হৃদয়ের ভাব ঈশ্বরের দিকে ঠিক সেইভাবে সমুত্থিত হয়। সেই কারণে কেহ বা ঈশ্বরকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করে, কেহ বা ভয়ে বিচলিত হয়, কেহ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন অর্থাৎ তাহারা উপাসনার সার্থকতা স্বীকার করেনা। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জাতিমাত্রেরই মধ্যে সাধারণ। কোন জাতিই সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে না, যদি তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম ভাব নাথাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে নিতান্ত অসভ্য জাতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই। কিন্তু সে মত বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। অভিজ্ঞতা প্রভাবে জানা গিয়াছে যে জাতি মাত্রেরই ভিতরে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জাগিয়া রহিয়াছে। সে বিশ্বাস মনুষ্যমাত্রেরই যার পর নাই স্বাভাবিক। মনুষ্য মাত্রেরই ইহা সাধারণ সংস্কার।

ধর্ম্ম ভাবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুকাল হইতে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিগত শতাব্দীতে এতৎ সম্বন্ধে যেরূপ গবেষণা চলিয়াছে তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। থিওডোর পার্কার বলেন যে ঈশ্বরে বিশ্বাস মনুষ্যের অন্তর্নিহিতবৃত্তি-প্রসূত, ইহা তাহার মনের চতুর্থ বৃত্তি। যেমন তাহার জ্ঞান আছে, হিতাহিত বিবেচনা আছে, প্রেম আছে, তেমনি তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। ইহা কোন কষ্টসাধ্য সিদ্ধান্ত বা মীমাংসার ফল নয়,কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ। সে যাহা কিছু চারিদিকে নিরীক্ষণ করে তৎসমস্তই তাহাকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বোধ দেয়, যাহা কিছু দেখে বুঝে সকলই সৃষ্ট, তাহার ভিতরে নিয়ম রহিয়াছে, শৃঙ্খলা রহিয়াছে, সকলই শাসনাধীন কোথাও বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলতা নাই, সকলের ভিতরে উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় রহিয়াছে; সহজেই বুঝিতে পারে যে অবশ্যই এক জন নিয়ন্তা রহিয়াছেন—যন্ত্রী রহিয়াছেন—উদ্দেশ্যবান পুরুষ রহিয়াছেন,যাঁহার এই সমুদয় সৃষ্টি,যিনি আমা অপেক্ষা জ্ঞানে শক্তিতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। এই যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধবোধ ইহা মনুষ্যের নিত্য ও স্বাভাবিক। সে যতই দেখে, অপরিবর্তনীয় শৃঙ্খলা দেখিতে পায়, একই

নিয়ম একই প্রণালী অবিরাম বাহ্যজগতে কার্য্য করিতেছে। আরও বুঝে, যাঁহার এই-সৃষ্টি, যাঁর এই শৃঙ্খলা, তাঁহার মৃত্যু নাই; বৃক্ষের ন্যায় লতার ন্যায় পশুপক্ষীর ন্যায় তাঁহার বিনাশ নাই, পরিবর্ত্তন নাই। তিনি অক্লান্ত ও অশ্রান্ত ভাবে একই নিয়মে একই ভাবে এই বিশ্বযন্ত্র চালাইতেছেন। একাকীই তিনি রহিয়াছেন, কেহ তাঁহার সহকারী নাই, কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তন থাকিলে জগতে এই অপরিবর্ত্তনীয়তা সম্ভব হইত না, অব্যভিচারী নিয়ম থাকিতে পারিত না।

মনুষ্য ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ ও পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে থাকে যে ঈশ্বর তাহার অন্তরের ভাব জানিতেছেন, সে যাহা কিছু চিন্তা করে অন্তরে যাহা কিছু গোপনে পোষণ করে ঈশ্বর সকলই দেখিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইবার কোন উপায় নাই। সে তাহার প্রতিবেশীকে বঞ্চনা করিতে সাহস করে না, ভয় হয় ঈশ্বরের দৃষ্টি সে এড়াইতে পারিবে না। তাহার হিতাহিত জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাকে আদেশ করে—বলিয়া দিতে থাকে যে গর্হিত কর্ম্ম আচরণ করিও না, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিষ্পাপ থাকিতে চেষ্টা কর। এই ভাবেই ধর্ম্মের বীজ ন্যায়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে। তাহার জ্ঞান ও নৈতিক-প্রকৃতি ধর্ম্মভাবের সহায় হয়। সে বুঝে যে ঈশ্বর ধর্ম্মের সহায়, ন্যায়কার্য্যানুষ্ঠানে তাহার উৎসাহ দাতা।

সে ক্রমে দেখে যে ঈশ্বর সকলের মধ্যে আনন্দ বিধান করিতেছেন, সকলের সকল অভাব বিমোচন করিতেছেন, তিনি সকলের বন্ধু, সকলের অন্ন-দাতা, সকলের পিতা মাতা ও আশ্রয়। এইরূপে ক্রমে অন্তরের ভিতরে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার বিকাশ। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সে দেখে যে ঝটিকা ও ঘূর্ণাবর্ত্ত আসিয়া মনুষ্যকে নির্ম্মূল করিতেছে, দুর্ভিক্ষ জনসমাজকে নিপীড়িত করিতেছে, ব্যাধি ও মৃত্যু আসিয়া সকলকে গ্রাস করিতেছে, তখন সে আপনার ক্ষুদ্র-জ্ঞানে ঈশ্বরের করুণার সহিত তাঁহার রুদ্র-ভাবের সমন্বয় করিয়া উঠিতে পারে না; মনে করে যে অকল্যাণের বুঝি স্বতন্ত্র দেবতা আছেন, যিনি মনুষ্যের সুখ-শান্তির প্রতি বিমুখ; জীব জন্তুকে বিপদে নিক্ষেপ করাই যাঁর কার্য্য, যিনি কেবলই বিপদ প্রেরণ করেন। তখন মনুষ্য ভয়ে এই শেষোক্ত দেবতার তৃপ্তিসাধনের জন্য অগ্রসর হয়, বিভিন্ন রূপ বলি প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে যায়। ক্রমে সে দয়াল ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, বিপদ প্রেরণকারী উপদেবতার শরণাপন্ন হয়। প্রেমময় ঈশ্বর যে তাহার নিকট বলি চাহেন না, তিনি উৎ-কোচের প্রার্থী নহেন, তিনি যে বন্ধু তিনি যে পিতা, একথা সে বিস্মৃত হইতে থাকে।

ধর্ম্মের ভিতরে এই ভাবে এই দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। উভয় ধর্ম্মই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, এই দুইই ধর্ম্ম বটে, কিন্তু একটি সৎ, আর একটি অসৎ বা ভ্রান্ত, একটি প্রেমের ধর্ম্ম, অন্যটি ভয়ের ধর্ম্ম।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রেমের ধর্ম্ম মনুষ্যের অন্তরকে ও চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে, ভয়ের ধর্ম্ম শাস্তির ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মের দিকে লোককে আকর্ষণ করে; পাপের জন্য তত নহে শাস্তির ভয়ে লোকে ধর্ম্মের অনুগত হইতে যায়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম শাস্তি ও পুরস্কার নিরপেক্ষ; দুঃখই হউক আর সুখই হউক সে দিকে না তাকাইয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক ধর্ম্মকে চায় ঈশ্বরকে চায়। ভয়ের ধর্ম্ম মানুষকে পাপানুষ্ঠানে ভাবী শা-স্তির ভয় দেখায়, পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে পুরস্কার

লাভের আশা প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহা সমুন্নত ধর্ম্ম নহে। ভয়ে ধর্ম্মের বাধ্যতা-স্বীকার প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। ভয়ের ধর্ম্ম মানবচরিত্রকে তাহার নৈতিক-ভাবকে দুর্ব্বল করিয়া তোলে।

আমরা প্রেমের ধর্ম্ম চাই—ভয়ের ধর্ম্ম চাই না। প্রেমের ধর্ম্মেই মুক্তি। হায় কবে প্রেমের ধর্ম্ম চারিদিকে জাগিয়া উ-ঠিবে, ভ্রান্ত-ধর্ম্মের ভ্রান্ত-সংস্কার এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে।*

বিশ্বযোগ।

শুন শুন বিশ্ববাসী গূঢ় সমাচার
অখণ্ড চেতনা সূত্রে গাঁথা এ সংসার।
অখণ্ড মঙ্গলে তার বিচিত্র বিধান।
অখণ্ড আনন্দে তার পূর্ণ পরিণাম।
অখণ্ড যোগেতে আছে যুক্ত সমুদয়।
অখণ্ড কালেতে সবে ভাসমান রয়।
অখণ্ড অভেদ ঐক্য লাভ করিবারে,
ধাইছে সকল গতি বিচিত্র আকারে।
বহু গতি হবে যবে একেতে মিলন
বিশ্বের পরম রূপ হবে দরশন।
সে পরম রূপ জ্যোতি হইলে বিকাশ,
অখণ্ড যোগের লীলা হইবে প্রকাশ।
বিশ্ব মাঝে বিশ্বমণি হেরিয়া তখন
সার্থক হইবে জন্ম সফল জীবন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

আত্মত্যাগ।

(Resignation কবিতার বঙ্গানুবাদ)

সতত অহিত, সহ অকাতরে,
ক'রনা বিলাপ মূঢ়ের প্রায়;
কি যে অভিপ্রায় বিধির অন্তরে,
মানব কেমনে বুঝিবে তা'র।
সময়ের দ্রুত প্রবাহে চলিছে
ভাসিয়া সকলি,—কি ক্ষতি কা'র?
আশার আলোক যদিও ছুটিছে,
হৃদয়ে তোমার আভাস তা'র।
কি হেতু প্রবিছ ক্রোড়ে আঁখিনীর,
তাড়না গঞ্জনা নিন্দিছ কেন?
পার্থিব বিপদে সঁপহ শরীর,
বিধির বিধানে আসিছে জেন।
সর্ব্বশক্তিমান জানেন সকল;
মোহবশে ক্ষোভ ক'রনা, কর'না;
সুখী হইবে পুনঃ দুখী জীবদল;
ভাবিয়া অন্তরে লভহ সান্ত্বনা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ।

নানা কথা।

দেবালয়।—গত ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৭ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেবালয়-গৃহে "ব্রহ্মদর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি মহর্ষির আত্মজীবনী হইতে কিয়দংশ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুমধুর ও ভাব-পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছিলেন। তৎপরে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেবালয় স্থাপ-নাবধি ইহার সহিত বিশেষ সহানুভূতি করিয়া আসিতেছেন।

স্মৃতি-সভা। বিগত ১০ আশ্বিন অপরাহ্ণ ৫ ঘটার সময়ে মহাত্মা রাজারামমোহন রায়ের সাম্বৎসরিক স্মৃতি-সভা মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্ব ও কবি-বর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা হইবে, এই সংবাদে সভা বসিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই সিটি-কালেজের তৃতীয়তলস্থ বৃহৎ হল লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যথা সময়ে এই দুই মহাত্মা গৃহে প্রবেশ করিলে জনস্রোত অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন নিরুপায় হইয়া কর্ত্তৃকর্ত্তা গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং নিম্নের প্রাঙ্গনে দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হইল। সেখানে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়া জনতা ও কোলাহল নিরস্ত করিতে লাগিলেন। তৃতীয়তলে প্রথমে একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত হইবার পর পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সংক্ষেপে প্রার্থনা করেন। পরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় রাজা রামমোহনকে সকল প্রকার স্বদেশোন্নতির মূল কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা

* Rev Charles Voysey সাহেবের বিগত ২৪এ এপ্রিলের উপদেশের সারাংশ।

করেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে নিজ প্রতিনিধি রূপে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া চলিয়া যান। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে একাদিক্রমে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন সুললিত ভাষায় রাজার বহুবিধ দেশোন্নতিকর কার্য্যের উল্লেখ করেন। পরে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ অষ্টাশীতিবর্ষীয় স্থবির শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কম্পিত-পদে দণ্ডায়মান হন। তিনি রাজা রামমোহন রায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে কিছু কিছু পুরাতন কাহিনী আলোচনা করিয়া উপবেশন করেন। অতঃপর সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বাবু দণ্ডায়মান হন। সমবেত সকলে করতালি ধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলে তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সকলকে পুলকিত করিলেন। তাঁহার প্রতিভাময়ী বক্তৃতার মর্ম্ম এই—অনন্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বর স্বীয় আদর্শকে এই বাঙ্গালীর গৃহজাত রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া বিশ্ব-মানমানবের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। রামমোহনের ভিতর দিয়া আমরা সেই আদর্শকেই গ্রহণ করিব। যাঁহাদের মৃত্যু আছে, তাঁহাদেরই জন্য স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাঁহারা অমর তাঁহারা আদর্শ রূপেই জগতে প্রকাশিত থাকেন, তাঁহাদের স্মৃতি-চিহ্নের প্রয়োজন হয় না। তিনি আরও বলিয়াছেন, হিন্দুর হিন্দুত্ব সেই স্থানেই বর্ত্তমান, যেখানে মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দু আপনার বক্ষে স্থান দিতে পারে, আপনার করিয়া লইতে পারে। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

আমরা দেখিতেছি যে উত্তরোত্তর রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি সাধারণের যেরূপ অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে ও তাঁহার বাৎসরিক সভায় যেরূপ লোক সংখ্যা অধিকতর হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে কোন সুবৃহৎ স্থানে ইহার অধিবেশন না করিলে আর চলিবে না। এখানে ইহাও উল্লেখ যোগ্য গত মাসে অনেকস্থানে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে।

—

প্রাপ্তি স্বীকার।

১৮৩২ শকের বৈশাখ হইতে ১৬ই আশ্বিন পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি।

নাম	স্থান	মূল্য
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র রায়	দেহড়দা	১৩৵০
„ „ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	২৲
„ „ লালবিহারী বসাক	„	৩৲
„ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর,	কাশিমবাজার	১২।৵০
„ বাবু বিনোদবিহারী সেন	বর্দ্ধমান	২॥০
শ্রীযুক্ত সম্পাদক হরিসেনা-মণ্ডলী	কলিকাতা	৩৲
„ বাবু হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়	কুচবিহার	১॥৶০
„ রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র বাহাদুর	খণ্ডরই	৯৶০
„ বাবু জগৎচন্দ্র নাথ	কৃষ্ণনগর	৫৲
„ K. Shambhu Sibarao,	Madras.	৶০
„ বাবু অবিনাশচন্দ্র পাল	আলিপুর	১৷০
„ „ নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়	সিলেট	৬৲
„ „ শিশির কুমার দত্ত	কলিকাতা	১॥০
„ মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান	বর্দ্ধমান	১২৸০
„ বাবু ভগবতীচরণ মিত্র	কলিকাতা	১॥০
„ „ নিরঞ্জন রায় চৌধুরী	বড়িসা	২৲
„ „ উমেশ চন্দ্র সুর	কলিকাতা	১॥৶০
„ „ প্রসাদদাস মল্লিক	„	৩৲
„ „ গৌরলাল রায়	কাকিনা	৬৷৵০
„ „ নরনাথ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
„ „ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	সৈদাবাদ	৬।৵০
„ „ রাধাকান্ত আইচ	নোয়াখালী	৫৲
„ „ বিহারিলাল মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
„ „ সতীশচন্দ্র মল্লিক	„	৬৲
„ „ অক্ষয়কুমার ঠাকুর	„	৩৲
„ „ লালবিহারী বসাক	„	৩৲
„ Dr. P. K. Mazumder	Burma	১৲
„ S. K. Lahiri	Calcutta	৩৲
„ বাবু বিনোদবিহারী দত্ত	„	১॥৶০
„ „ বনমালী চন্দ্র	„	৩৲
„ রাজা হৃষিকেষ লাহা বাহাদুর	„	৩৲
„ বাবু গোবিনলাল দাস	„	৩৲
„ „ মনোহর মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	৯॥/০
„ „ সীতানাথ রায়	কলিকাতা	১৲
„ „ সীতানাথ বক্সী	আড়াসিনী	৩৶০
„ ডাক্তার ডি, এন, চাটার্জ্জি	কলিকাতা	৩৲
„ রায় রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর	দিনাজপুর	১০৵০
„ বাবু কেদারনাথ রায়	কলিকাতা	৩৲
„ S. P. Sinha	„	২৩/০
„ বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	ঘোষনগর	৪৸৵০
„ „ ললিতমোহন রায়	কলিকাতা	১॥০
„ „ রায় নৃত্যগোপাল বসু বাহাদুর		৬।৵০
„ রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
„ বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	হরিপুর	৬।৵০
„ „ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৩৲
		২০৯॥০

—

বিজ্ঞাপন।

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

গীতার প্রশ্ন উত্তর।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

১২ প্রঃ।

জ্ঞান ও কর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক শ্লোকগুলি লিখিয়া দেও।

১২ উঃ।

১। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ,
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

২। অপিচেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।

৩। নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।

৪। যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।

উপরি লিখিত শ্লোক কয়টিতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে—কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ কেননা সর্ব্ব কর্ম্ম জ্ঞানে সমাপ্তি লাভ করে, কেননা কর্ম্মশেষে শুদ্ধচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানীর আর কোনই কর্ম্ম থাকে না। নরাধম পাপিষ্ঠ ও যদি তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানভেলায় অনায়াসে পাপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র ইহসংসারে আর কিছুই নাই। তাহা হইতে সাধক স্বয়ং পরমেশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হইয়া আত্ম-জ্ঞান লাভ করেন। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়, জ্ঞানাগ্নি সেইরূপ সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে। ইহাতে জ্ঞানেরি শ্রেষ্ঠতা প্রতি-পাদিত হইতেছে।

প্রিয়ম্বদা।

১২ প্রঃ।

জ্ঞান ও কর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক শ্লোকগুলি লিখিয়া দেও।

১২। উঃ। জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্বন্ধ এই যে, জ্ঞান লাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্ম তাহার সাধন বা উপায়। নিষ্কাম কর্ম্মসাধন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে পর তবে জ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে। "কর্ম্ম বিনা জ্ঞান খঞ্জ, জ্ঞান বিনা কর্ম্ম অন্ধ"। উভয়েরই সম্পূর্ণতার পক্ষে পরস্পরের প্রয়োজন। তবে কর্ম্ম যে পথের আরম্ভ, জ্ঞান সেই পথের লক্ষ্য বা শেষ। সুতরাং জ্ঞানেরই আসন উচ্চতর। প্রকৃত জ্ঞানী ভগবদ্ভক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না, এবং সকল ভক্তের মধ্যে

জ্ঞানীই ভগবানের প্রিয়তম বলা হইয়াছে। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে প্রতিপন্ন হয়ঃ—

(ক) শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

(খ) অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥

(গ) যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

(ঘ) নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

(ঙ) দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥

ইন্দিরা।

১৩ প্রঃ।

গীতার যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

দুঃখহা যোগ কাহার হয়?

দুঃখ সংযোগ বিয়োগ যোগ কি? এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগের তুলনায় গীতার বিশেষত্ব দেখাও।

১৩ উঃ। পতঞ্জলি মতে যোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধ। ইহা অষ্টাঙ্গ; যম নিয়ম আসন, প্রত্যাহার প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণা সমাধি—ইহার প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ; অপর তিনটি অন্তরঙ্গ যথা ধ্যান ধারণা এবং সমাধি। গীতার মতে যোগ যদিও চিত্তবৃত্তি নিরোধ এবং সংযমসাধ্য তবু তাহা শুধুই চিত্তবৃত্তি নিরোধ নহে—তাহা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত যুক্ত অবস্থা। পতঞ্জলি মতে ঈশ্বর প্রণিধান চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় মাত্র, চরম লক্ষ্য নয়—ঈশ্বর না হইলেও পতঞ্জলি অনুমোদিত যোগ সাধিত হইতে পারে কিন্তু গীতায় ঈশ্বর ভিন্ন যোগ হয় না—যেখানেই যোগের উল্লেখ সেইখানেই ঈশ্বর ব্যাখ্যাত। চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া কি হইল যদি তাহা দ্বারা চরম এবং পরম আর কিছু লাভ করিতে না পারি? সাংখ্য মতে কৈবল্য স্বরূপে অবস্থান, প্রকৃতি হইতে পুরুষের ভিন্নতা উপলব্ধি এবং পুরুষ যখন শুদ্ধ, বুদ্ধ, একক, কেবল, তখনই জীব যোগসিদ্ধ হয়েন। এই যোগ দুঃখ নিবৃত্তি কারক অভাবাত্মক, কিন্তু গীতার যোগ ভাবাত্মক অতীন্দ্রিয় পরম সুখ।

সাধক যখন সমদর্শী হয়েন তখনই তিনি যোগ যুক্ত—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

গীতায় যোগের অর্থ সর্ব্বত্র সমান নয়, উপরি লিখিত শ্লোকে সাম্যকে যোগ বলা হইতেছে আবার বলা হইয়াছে

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং—

অর্থাৎ ইহলোকে বুদ্ধিযুক্ত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সুকৃতি দুষ্কৃতি উভয়ই ত্যাগ করেন, সেই নিমিত্ত যোগ সাধন কর, যোগ কর্ম্মে কুশলতা। এখানে কৌশল অর্থে যখন কৃতকর্ম্ম আমাদিগকে বাঁধিতে পারে না অথচ কর্ম্ম সাধিত হয়, আমরা কর্ম্ম ফলে আবদ্ধ হই না, তখনই তাহা কুশল কর্ম্ম—তাহা যোগ। এমন ভাবে কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে যে কর্ম্মবন্ধের ক্লেশ ভোগ না থাকে—ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করা নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহাই নিপুণ কর্ম্ম, তাহাই যোগ। আমাদের মধ্যে সাধারণ বিশ্বাস যে শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন করিলেই যোগমার্গে অগ্রসর হইতে পারা যায় কিন্তু গীতার মত ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। গীতা বলেন যাহারা শরীরকে নিষ্ঠুর ভাবে ক্লিষ্ট করে, তাহারা নিকৃষ্ট আসুরিক প্রকৃতি; তাহাদের যোগ লাভ হয় না। গীতার মতে অতিভোজন কিম্বা উপোষণে, অতিনিদ্র কিম্বা বিনিদ্রের যোগ হয় না। কিন্তু যিনি যুক্তাহার বিহার, যিনি

যুক্তনিদ্র এবং জাগ্রত, যিনি যুক্তচেষ্ট, তাঁহারি দুঃখহা যোগ হইয়া থাকে।

গীতার ভাষায় বলিতে গেলে—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ
নচাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবচার্জ্জুন।
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

প্রিয়ম্বদা।

১৩ প্রঃ।

গীতার যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। দুঃখহা যোগ কাহার হয়? দুঃখসংযোগবিয়োগ যোগ কি? এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগের তুলনা করিয়া গীতার বিশেষত্ব দেখাও।

১৩ উঃ। গীতার যোগ সেশ্বর যোগ। অর্থাৎ ঈশ্বরলাভই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি যে দিক দিয়াই হোক্ সেই এক পরমাত্মায় পহুঁছিতে হইবে। যোগ কথাটা গীতায় নানাপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত, কখনো "সমত্ব" কখনো "কর্ম্ম-কুশলতা" কে যোগ বলা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য সেই এক পরমাত্মায় জীবাত্মা যুক্ত করা। এবং উপায়ও এক বলা যাইতে পারে—চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সংযম, বৈরাগ্য, অভ্যাস এবং ঈশ্বর প্রণিধানের ক্রমাভি-ব্যক্তি। ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। তবে অল্পবুদ্ধি মনুষ্য যদি অন্যান্য নিকৃষ্টতর ক্ষণস্থায়ী উপায় অবলম্বন করে তাহারাও সেই অনুসারে ফললাভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ভক্তি সহ-কারে যে যেমন ভাবেই তাঁকে চায় ভগবান তাহার আশা পূর্ণ করেন। সাংখ্য ও পাত-ঞ্জলের যোগশাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া গীতা তাহাতে ঈশ্বরের প্রাধান্য যোগ করিয়া তাহাদের সম্পূর্ণতর করিয়াছে, এবং ষড়দর্শন সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছে। আমাদের একটা সাধারণ সংস্কার যে যোগাভ্যাসের নিমিত্ত শরীর শোষণ এবং কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক। কিন্তু গীতা তাহার অনুমোদন করেন না। মিতা-চারই গীতার আদর্শ—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈবচার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

এই প্রকার মিতাহারী মিতাচারী ব্যক্তি-রই দুঃখহা যোগ হয়। "দুঃখ সংযোগ বিয়োগ যোগ" অর্থাৎ আত্যন্তিক শারী-রিক ক্লেশে যে দুঃখ, সেই দুঃখহান যোগ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গীতা ঘোর-তর কায়ক্লেশের পক্ষপাতী নহেন। এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের সহিত গীতার পার্থক্য এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্য-পথের সহিত ঐক্য লক্ষিত হয়। গীতার যে যোগাভ্যাস তাহা সন্ন্যাসী গৃহী সকলেরই সাধ্যায়ত্ত, প্রথমে চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক ঈশ্বরে মনঃ সমাধান করিতে হইবে। যদি তাহা না পার ত ক্রমে ক্রমে অভ্যাস দ্বারা মন স্থির করিতে হইবে। যদি তাহাও না পার ত তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করি-লেই হইবে। যদি তাহাও নিতান্ত না পার ত অনন্যমনা হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের আশা পূর্ণ করিবেন। এই তত্ত্বে বেশ একটি সান্ত্বনা লাভ হয়।

ইন্দিরা।

১৪ প্রঃ।

কর্ম্ম সন্ন্যাস এবং কর্ম্ম যোগ এই দুয়ের মধ্যে গীতার মতে কোন্‌টি প্রধান? দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি শ্লোক দেও।

১৪ উঃ। গীতার মতে কর্ম্ম যোগ এবং কর্ম্ম সন্যাসের মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ কেন না কর্ম্মযোগ ভিন্ন জ্ঞানযোগ লাভ হয় না এবং জ্ঞানযোগ লাভ না হইলে আমাদের আত্মজ্ঞান বিকশিত হয় না, আত্মজ্ঞানী না হইলে আমরা কর্ম্ম সন্যা-

সের অধিকার প্রাপ্ত হই না। যে তত্ত্বজ্ঞান, পরাবিদ্যা, লাভ করাই মনুষ্য জীবনের চরম সার্থকতা তাহা লাভ করিতে আমাদিগকে কর্ম্মযোগের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়—কর্ম্মই আমাদের হৃদ্‌গ্রন্থি সকল শিথিল করিয়া দেয়, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি লাভ করিতে সহায় হয় এবং অবশেষে সেই চির আকাঙ্ক্ষিত পরম পুরুষের সহিত যোগযুক্ত করে। আত্মজ্ঞানী ভিন্ন অপর কেহ নৈষ্কর্ম্মের অধিকারী নহেন, সাধারণ ব্যক্তির কর্ম্মসন্যাস তামসিক জড়তা মাত্র।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়,
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥
অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসীচ যোগীচ ন নিরগ্নিঃ নচাক্রিয়ঃ ॥

প্রিয়ম্বদা।

১৪ প্রঃ।

কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ—এই দুয়ের মধ্যে গীতার মতে কোনটি প্রধান? দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি শ্লোক দেও।

১৪ উঃ। কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। যে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করে, তাহার যে সদ্গতি হয়, নিরগ্নি নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির তাহা হয় না। কর্ম্ম বিনা সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। কি কি কারণে ও কিরূপে কর্ম্ম করা উচিত এবং কে নৈষ্কর্ম্মের অধিকারী তাহা পূর্ব্বেই কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। যজ্ঞ দান প্রভৃতি কর্ম্ম গীতা অনুমোদন করেন, যদি অহঙ্কার প্রসূত না হইয়া দেবতার প্রীতি-উদ্দেশে করা হয়। বরং না করিলে দোষ। যে ব্যক্তি অন্নাদি দেবোদ্দেশে উৎসর্গ না করিয়া কেবল মাত্র উদর পূরণার্থে খায়, তাহাকে 'স্তেন' বা চোর বলা হইয়াছে।

ইন্দিরা।

১৫ প্রঃ।

গীতার আদর্শ যোগীর যে বর্ণনা আছে তাহার মধ্য হইতে ৩টি শ্লোক বাছিয়া বল।

১৫ উঃ। গীতার মতে তিনিই আদর্শ যোগী যিনি ঃ—

১। বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।
২। ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতংমনঃ
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ
৩। ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।
৪। যো হন্তঃ সুখোহন্তরারাম স্তথান্ত র্জ্যোতিরেব যঃ
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥

প্রিয়ম্বদা।

প্রঃ ১৫।

১৫। গীতার আদর্শযোগীর যে বর্ণনা আছে তাহার মধ্য হইতে ৩টি শ্লোক বাছিয়া বল।

উঃ।

(ক) যো হন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥
(খ)ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥
(গ) যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

ইন্দিরা

১৬ প্রঃ।

যোগীশ্রেষ্ঠ কাহাকে বলা যায়?

লোক সম্বন্ধে—ঈশ্বর সম্বন্ধে (শ্লোক স্বর্থ সহিত)

১৬ উঃ। লোক সম্বন্ধে তিনিই যোগীশ্রেষ্ঠ যিনি

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।

বিদ্যা শাস্ত্রশিক্ষা বিনয়ঃ সুশীলভাবঃ, তৎসম্পন্নে যুক্তে ব্রাহ্মণে গবি ধেনুজাতীয়ে, হস্তিনি মাতঙ্গে শুনি কুক্কুরে শ্বপাকে চণ্ডালে চ পণ্ডিতাঃ বুধাঃ সমদর্শিনঃ সমদৃষ্টিশীলাঃ তেষাং দৃষ্টৌ পরমাত্মনঃ অংশত্বাৎ সর্ব্বএব সমানঃ।

পণ্ডিত সকল বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ধেনু হস্তি কুকুর এবং চণ্ডালে সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি। সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে পর-

মাত্মা বর্ত্তমান এই অভেদ বুদ্ধিতে তাঁহারা সকলকেই সমান মনে করেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ যোগী তিনি, যিনি

যোগীনামপিসর্ব্বেষাম্ মদ্গতেনান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সমে যুক্ততমো মতঃ।

মদ্গতেনান্তরাত্মনা একান্ত ভক্তিপরায়ণ-হৃদয়েন শ্রদ্ধাবান্ বিশ্বাসনম্রচিত্তঃ যঃ মাং ভজতে উপাসতে সর্ব্বেষাম্ যোগীনামপি সাধকানামপি সঃ যুক্ততমঃ যোগীশ্রেষ্ঠ ইতি মে মম মতঃ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন

যিনি ভক্তিপরায়ণ আমাতে একান্ত সমর্পিতচিত্ত, যিনি শ্রদ্ধার সহিত আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন তিনি আমার মতে যোগীশ্রেষ্ঠ।

প্রিয়ম্বদা।

১৬ প্রঃ।

যোগী শ্রেষ্ঠ কাহাকে বলা যায়?

লোক সম্বন্ধে—ঈশ্বর সম্বন্ধে—(শ্লোক অর্থ সহিত)

উঃ।

(ক) আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতিযোঽর্জ্জুন
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥

যে আত্মবৎ বা নিজের সহিত তুলনা করিয়া অপর সকলের সুখদুঃখ দেখে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী। (লোক সম্বন্ধে)

(খ) যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

আমাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া যে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক আমার ভজনা করে, যোগীদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যোগী। (ঈশ্বর সম্বন্ধে)

ইন্দিরা।

১৭ প্রঃ।

যোগে শ্রদ্ধাবান অথচ যোগসিদ্ধি লাভে অক্ষম, এইরূপ যোগভ্রষ্টের গতি কি হয়?

১৭ উঃ। যিনি শ্রদ্ধাবান অথচ যোগ-সিদ্ধ হইতে পারেন নাই—তাঁহার বিনাশ নাই, তিনি ছিন্ন্ মেঘের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হয়েন না, পরজন্মে তিনি পুণ্যবলে সাধু শ্রীসম্পন্ন ভক্তিমানের গৃহে জন্ম লাভ করেন। মৃত্যু হইলে বহুকাল পুণ্যলোকে বসতি করেন।

প্রিয়ম্বদা।

১৭ প্রঃ।

যোগে শ্রদ্ধাবান অথচ যোগসিদ্ধি লাভে অক্ষম, এইরূপ যোগভ্রষ্টের গতি কি হয়?

১৭ উঃ। যে "কল্যাণকৃৎ" তাহার কখনো দুর্গতি হয় না। যে ভক্তিশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যোগাভ্যাস আরম্ভ করিয়া দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সিদ্ধিলাভ করিতে না পারে, সে পরজন্মে শ্রীমন্ত পুন্যবান ব্যক্তির গৃহে জন্মলাভ করে; কিম্বা যোগীর ঘরে স্থান পায়, যদিও সে গতি দুর্লভতর। পূর্ব্বজন্মে সে যতটাই যোগসাধনে কৃত-কার্য্য হইয়া থাকুক্ না কেন, পরজন্মে সেই অভ্যাসবশতঃ আরও বেশিদূর সাধনে সক্ষম হয়, এবং এই প্রকারে জন্ম হইতে জন্মান্তরে ক্রমশঃই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়, ছিন্নাভ্রের ন্যায় ভ্রষ্ট হয় না।

ইন্দিরা।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল

ষষ্ঠ উপদেশ।

জগতের নৈতিক শৃঙ্খলা ইতিপূর্ব্বে নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমরা এখন নৈতিক সত্যকে পাইয়াছি, মঙ্গলের ধারণাকে পাইয়াছি, এবং মঙ্গলের ধারণার সহিত যে অবশ্যকর্ত্তব্যতা সংযুক্ত আছে তাহাও পাইয়াছি। সার-সত্যে পৌঁছিয়াও যে তত্ত্ব আমাদিগকে থামিতে দেয় নাই, যে তত্ত্ব বাস্তব সত্তার মধ্যেও পরম প্রজ্ঞার অনুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিয়াছে, এখানে সেই একই তত্ত্ব, সেই

পরম পুরুষের সহিত মঙ্গলভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছে,—যিনি মঙ্গলভাবের প্রথম ও শেষ পত্তনভূমি।

অন্যান্য সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী সত্যের ন্যায়, নৈতিক সত্য ও সত্তা নিরপেক্ষ, কেবল একটা সূক্ষ্মভাবের অবস্থায় থাকিতে পারে না। আমাদের অন্তরে এই নৈতিক সত্য কেবল ধারণার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু এমন কোন পুরুষ আছেন—এই নৈতিক সত্য যাঁর শুধু ধারণার বিষয় নহে, পরন্তু নৈতিক সত্যই যাঁহার স্বরূপ।

যেমন, সমস্ত সত্যের সহিত একটি অখণ্ড মূল-সত্যের যোগ আছে, সমস্ত সৌন্দর্য্যের সহিত, একটি অখণ্ড মূল সৌন্দর্য্যের যোগ আছে, সেইরূপ সমস্ত নৈতিক তত্ত্বের সহিত একটি অখণ্ড মূলতত্ত্বের যোগ আছে—সেই মূলতত্ত্বটি মঙ্গল। এইরূপে আমরা ক্রমশ এমন একটি মঙ্গলের ধারণায় উত্থিত হই, যে মঙ্গল স্বরূপত মঙ্গল, যে মঙ্গল পরিপূর্ণ মঙ্গল, যাহা সমস্ত বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য হইতে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ এবং যাহার দ্বারা বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য সকল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অতএব যথাযথরূপে বলিতে গেলে, এই পূর্ণ মঙ্গল—মঙ্গলস্বরূপ পূর্ণ পুরুষ ছাড়া আর কাহার উপাধি হইতে পারে?

অনেকগুলি পূর্ণ পুরুষ থাকা কি সম্ভব? যিনি পূর্ণ সত্য, যিনি পূর্ণ সুন্দর, তিনিই কি পূর্ণ মঙ্গল নহেন? পূর্ণতার ধারণার সহিত, পূর্ণ অখণ্ডতা, পূর্ণ একতার ধারণা সংজড়িত। সত্য সুন্দর ও মঙ্গল—এই তিন তত্ত্ব স্বরূপত পৃথক্ নহে। ইহারা আসলে একই—তিন প্রধান উপাধিরূপে ইহারা পৃথক্ রূপে আলোচিত হইয়া থাকে মাত্র। আমাদের মনই এইরূপ ভেদ স্থাপন করে; কেন না, ভেদ না করিয়া, বিভাগ না করিয়া, আমাদের মন কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু এই তিন তত্ত্ব যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, সেখানে এই তত্ত্বগুলি এক ও অখণ্ড; এবং সেই পুরুষ যিনি "তিনে এক, একে তিন," যিনি একাধারে পূর্ণ সত্য, পূর্ণ সুন্দর ও পূর্ণ মঙ্গল—তিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নহেন।

সৃষ্ট জীবদিগের যে সকল সদ্‌গুণ বা উপাধি আছে, তাহার মধ্যে এমন কোন বাস্তব সদ্‌গুণ বা উপাধি আছে কি না—যাহা স্রষ্টার মধ্যে নাই? কারণ ছাড়া কার্য্য আর কোথা হইতে স্বকীয় বাস্তবতা ও সত্তা প্রাপ্ত হইতে পারে? কার্য্যের যে বাস্তবতা, কার্য্যের যে সত্তা, সে তাহার কারণ হইতেই প্রসূত হইয়া থাকে। অন্তত, কার্য্যের যাহা কিছু বাস্তবতা, তাহা তাহার কারণের মধ্যেই অবস্থিত। কার্য্যের যে বিশেষত্ব—সে বিশেষত্ব, কার্য্যের নিকৃষ্টতাতে, কার্য্যের হীনতাতে, কার্য্যের অপূর্ণতাতে। কেবল উহার দ্বারাই কার্য্যের পরাধীনতা, কার্য্যের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। কার্য্যের মধ্যে অধীনতার নিদর্শন, অধীনতার নিয়ম বিদ্যমান। অতএব যদিও কার্য্যের অপূর্ণতা হইতে কারণের অপূর্ণতারূপ সিদ্ধান্তে আমরা বৈধরূপে উপনীত হইতে পারি না, কিন্তু আমরা কার্য্যের উৎকৃষ্টতা হইতে, কারণের পূর্ণতারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। নচেৎ কার্য্যের মধ্যে এমন কিছু উৎকৃষ্ট জিনিস থাকিয়া যায় যাহার কোন কারণ নাই।

আমাদের ঈশ্বরবাদের ইহাই মূলতত্ত্ব। ইহার মধ্যে কোন নূতনত্বও নাই, অতিসূক্ষ্মত্বও নাই। তবে কিনা, এই তত্ত্বটিকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া, এখনও পর্য্যন্ত আলোকে আনা হয় নাই। আমাদের নিকট এই তত্ত্বটি অতীব সারবান্

ও প্রামাণিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বটির সাহায্যেই আমরা কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হই।

ঈশ্বর কোন ন্যায় শাস্ত্র-সিদ্ধ সত্তা নহেন, ন্যায় শাস্ত্রের অনুমান-যুক্তির দ্বারা অথবা বীজগণিতের সমীকরণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার স্বরূপের ব্যাখ্যা করা যায় না। যখন কেহ, জ্যামিতিবেত্তা ও নৈয়ায়িকের পদ্ধতি-অনুসারে, কোন একটি প্রধান উপাধি হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, পরম্পরাক্রমে ঈশ্বরের অন্যান্য উপাধি নির্ণয় করেন, আমি জিজ্ঞাসা করি—তখন তিনি কতকগুলি বস্তু-নিরপেক্ষ সূক্ষ্মভাবের কথা ছাড়া আর কিছু কি প্রাপ্ত হন? বাস্তব ও জীবন্ত ঈশ্বরে উপনীত হইতে হইলে, এই প্রকার নিষ্ফল তর্ক-বিদ্যার জল্পনা-জাল হইতে বাহির হওয়া আবশ্যক।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের যে প্রথম ধারণা, অর্থাৎ অসীম-পুরুষের ধারণা, এই ধারণাটিও আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে। আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি সত্তা ও সসীম সত্তা—এই যে নিজের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, ইহা হইতে আমরা অব্যবহিত রূপে এমন একটি সত্তার ধারণায় উপনীত হই, যে সত্তা আমাদের সত্তার মূলতত্ত্ব, যে সত্তা অসীম। এই সারবান্ অথচ সরল যুক্তি-প্রণালীটি আসলে দেকার্টের যুক্তি-প্রণালী;—তিনি যে যুক্তির পথটি খুলিয়া দিয়াছেন, সেই পথটি আমরা অনুসরণ করিব। তিনি একস্থানে আসিয়া শীঘ্র থামিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা থামিব না। আমরা যেমন আমাদের সসীম সত্তার কারণ রূপে একটি অসীম সত্তাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হই, সেইরূপ আমাদের উৎকৃষ্ট চিত্তবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়াও আমরা একটি অসীম কারণে গিয়া উপনীত হই। অতএব ঈশ্বর আমাদের নিকট শুধু অসীম নহেন, তিনি এমন কোন অনির্দ্দেশ্য সূক্ষ্মভাবমাত্র-সার ঈশ্বর নহেন যাঁহাকে আমাদের হৃদয় ও মন গ্রহণ করিতে পারে না, পরন্তু তিনি সুনির্দ্দিষ্ট বাস্তব ঈশ্বর, আমাদের ন্যায় তিনি নৈতিক পুরুষ।

অতএব, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্য ও সুন্দরের ন্যায় তিনি মঙ্গলেরও মূল কারণ ও চরম ভিত্তি। আমরা যেরূপ নৈতিক পুরুষ, সেইরূপ নৈতিক পুরুষের তিনি মূল-আদর্শ। আমাদের এমন কোন উৎকৃষ্ট গুণ নাই যাহার মূল-প্রস্রবণ তিনি নহেন, এবং যাহা অনন্ত পরিমাণে তাঁহাতে নাই।

যেমন মনে কর,—মানুষের স্বাধীনতা আছে, আর ঈশ্বরের স্বাধীনতা নাই—ইহা কি কখন হইতে পারে? ইহা কেহই অস্বীকার করে না যে, যিনি সকল পদার্থের কারণ, যিনি স্বয়ম্ভু, তিনি কাহারও অধীন নহেন। কিন্তু Spinoza, ঈশ্বরকে সমস্ত বাহ্য বাধার অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া একটা সূক্ষ্ম আভ্যন্তরিক অবশ্যম্ভাবিতার বন্ধনে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছেন,—যে আভ্যন্তরিক অবশ্যম্ভাবিতাকে তিনি সত্তার পূর্ণতা বলিয়া মনে করেন। অবশ্য সে সত্তা, পুরুষ-সত্তা নহে। কিন্তু স্বাধীনতাই পুরুষের অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তার মুখ্য ধর্ম্ম। অতএব ঈশ্বরের যদি স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর মানুষ হইতেও নিকৃষ্ট। ইহা কি অত্যন্ত অদ্ভুত নহে,—সৃষ্ট জীব যে আমরা, আমরা আমাদের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারি, আর যিনি আমাদের স্রষ্টা, তিনি একটা অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তি-নিয়মের অধীন; অবশ্য সেই অভিব্যক্তির কারণ তাঁহার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু সেই কারণটি একপ্রকার বস্তু-নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম শক্তি,

যান্ত্রিক শক্তি, দার্শনিক শক্তি; এই যান্ত্রিক কারণটি আমাদের অনুভূত স্বাধীন পুরুষগত কারণ অপেক্ষা অতীব নিকৃষ্ট। অতএব ঈশ্বর স্বাধীন, কেননা আমরা স্বাধীন; কিন্তু আমরা যেরূপ স্বাধীন, তিনি সেরূপ স্বাধীন নহেন; কেননা ঈশ্বর সমস্তই আমাদের মতন, অথচ তিনি আমাদের মতন কিছুই নহেন। আমাদের মত সমস্ত সদ্‌গুণই তাঁহার আছে, কিন্তু সেই সব সদ্‌গুণ আমাদিগের অপেক্ষা অনন্তগুণে উন্নত। তাঁহার অসীম স্বাধীনতার সহিত, অসীম জ্ঞান সংযুক্ত। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া যেরূপ অব্যর্থ, চিন্তা আলোচনার অনিশ্চয়তা হইতে মুক্ত, যাহা কিছু মঙ্গল, তিনি যেরূপ এক কটাক্ষেই উপলব্ধি করেন—সেইরূপ তাঁহার স্বাধীনতার ক্রিয়াও স্বতস্ফূর্ত্ত ও অযত্ন-সম্পাদিত। ("স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়াচ")।

রাজা রামমোহন রায়।*

জগতের যে যে দেশে যতগুলি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্মকালে সেই সেই দেশ অবনতির তমোগর্ভে সুপ্ত ছিল। তাঁহারা সমাজের মিলন সম্পাদনের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ হইতে আরম্ভ করিয়া নানক, কবির, চৈতন্য সকলেই সমাজের ঘোর দুরবস্থার সময় আবির্ভূত হইয়াছেন। এবং তাঁহাদের একটি প্রধান কাজ ছিল, সমাজের ধর্ম্মগত, সংস্কারগত এবং অবস্থাগত বিভেদ বিচ্ছেদকে চূর্ণ করিয়া মানব সম্প্রদায়কে একসমতলে আনয়ন করা। কিন্তু তাহা বলের দ্বারা নহে। হস্ত প্রসারণ করিয়া মন্ত্র পড়িলে, যেমন বিক্ষুব্ধ-সিন্ধু মুহূর্ত্তে মন্ত্রাহত হইয়া নীরব হইয়া যায়; মহাপুরুষগণের প্রেমের মন্ত্রে বিক্ষুব্ধ মানব-সমাজের বিভেদ এবং বিরোধ তেমনিই শান্ত হইয়া গিয়াছে।

জগতের মধ্যে যতগুলি কঠিন কর্ম্ম আছে তন্মধ্যে বোধ হয় মানুষের সহিত অন্য মানুষের আন্তরিক যোগ সংস্থাপন করাটাই কঠিনতম। আমার ও তোমার মধ্যে বিচার, বুদ্ধি, রুচি এবং কামনা যে একটি প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। শুধু তুমি আমি নহি, পৃথিবীর প্রত্যেক লোক যে অন্য লোক হইতে স্বতন্ত্র! মানুষের আকারগত বৈসাদৃশ্যের ন্যায় তাহার মনও যে বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া রচিত! তা যদি না হইত তবে মানুষের কাব্যে সাহিত্যে, সাধনায়, সফলতায় এত বিভিন্নতা, এত অসংখ্য বিচিত্রতার সৃষ্টি হইত না। তাহা হইলে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় বিশ্ব-সৃষ্টি, প্রত্যেক মানব-মনকে একই ছাঁচে ঢালিয়া ছাড়িয়া দিতেন। সেই জন্যই জাতিতে জাতিতে এত যুদ্ধ, এত মারামারি, এত হানাহানি কাটাকাটি! একজাতি, আপনার বিশেষত্ব লইয়া অপর জাতিকে ছাড়াইয়া যাইতে চায়, অন্য জাতি আবার নিজের বিশেষত্ব লইয়া বুক্ ফুলাইয়া দাঁড়ায়—এ যেমন জাতিতে জাতিতে, তেমনি সমাজে এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও সেই ভাব। মহাপুরুষগণ মানুষের মধ্যে এই পার্থক্যের মহাগহ্বরকে পূর্ণ করিয়া যখন মানবের মধ্যে যোগ সংস্থাপন করেন, তখন সমাজে একটি বিরাট্ প্রাণের স্পন্দন তালে তালে বাজিতে থাকে। কিন্তু ইহা সাধন করা বড় কঠিন, অতি দুরূহ। মানব-সমুদ্রের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিকে যে জোয়ারের জল একত্রিত করিতে পারে, সে জলধারা

---

* এই প্রবন্ধটী শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি সভায় পঠিত।

আনয়ন করাটা একটা কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বর যে আপনার ইচ্ছার মধ্যেই জড় ও চেতন রাজ্যে এত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন সুতরাং যে নর-দেবতা আমাদের এই বিভিন্ন মতগুলিকে একসূত্রে বদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, তিনি ঈশ্বর-দত্ত একটি আশ্চর্য্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কারণ বিচিত্রতার সৃষ্টি করা যাঁর কার্য্য, তাহাকে বিনাশ করাও তাঁর শক্তি ব্যতীত সম্ভব নহে।

কৈ অন্য কাহারো আহ্বানে ত এত লোক একত্রিত হয় নাই! কিন্তু বুদ্ধ যে দিন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া, খৃষ্ট পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া এবং মহম্মদ কোরেশদের মধ্যে দাঁড়াইয়া সমগ্র মানবকে আহ্বান করিয়াছিলেন তখন দরিদ্র হইতে ধনী পর্য্যন্ত সকলেই একত্রিত হইয়াছিলেন, তাই চণ্ডাল এবং মগধরাজ বিম্বিসার একই জনের শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন। মানুষকে এক করাটা কি কঠিন কার্য্য! এই সমস্যা এখনও যুদ্ধবিগ্রহ আপনার অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, রক্তের স্রোতের দ্বারা মীমাংসা করিতে পারে নাই। ইতিহাস তাহা পূরণ করিতে গিয়া নীরব হইয়া গেছে। দার্শনিক চিন্তার খেই হারাইয়াছেন এবং কবি বিহ্বল হইয়া গেছেন। সভ্য-জগতের বৃহত্তম সমস্যাটিও হইতেছে তাই। ইহাকে পূরণ করার ক্ষমতা মানুষের সহজবুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে। তাই মহাপুরুষগণ সেই মিলন-মন্ত্রপূত দণ্ড হস্তে করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাহা বিধাতৃ দত্ত ক্ষমতা। তপস্বী রাম মোহন ভারতবর্ষের ভূমিতে যে সুরধনীর আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, তাহার প্লাবনে পর্ব্বত সমান বাধাবিঘ্ন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাতে মানুষ পরস্পরের মধ্যে একটি পরম যোগ অনুভব করিয়াছে। তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে, ভারতবর্ষ আপনার ত্রিভুজের মধ্যে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে তাহা নহে; সমগ্র বিশ্বের মধ্যে তাঁহার অবস্থান এবং কারণভূমি। ভারতের বড় দুঃখের দিনে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে নাগপাশ হইতে মুক্তি দিয়াছেন, অন্যথা ভারত আজ সেই পাশের প্রভাবে একেবারে নিস্তেজ এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত। তখনকার দিনে মরুপথযাত্রী ভারতবাসী, পশ্চিমগগন-প্রতিফলিত যে বারি-মরীচিকা দেখিয়াছিল, প্রথমে রামমোহন রায়ই বলিয়াছিলেন যে তাহা ভুল,—তাহা ভারতবর্ষের নহে। রামমোহন রায়ই প্রথমে পদদলিত মরুপথ খনন করিয়া ভারতবর্ষের প্রাণের, ভারতবর্ষের আপনার সনাতন জলধারাটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম ও বাঙ্গলাভাষা প্রচার করিতে সেই জন্যই তিনি প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপকার করিতে রামমোহন রায় যে কেবল আপনার দেশকেই টানিয়াছিলেন তাহা নহে—সমগ্র মানবযাত্রার অনন্ত স্রোতকে তিনি আনন্দে, উল্লাসে অগ্রগামী করিয়া দিয়াছেন—এ কথা তাঁহার জীবনীতে দেখিতে পাই।

তিনি তপস্যা করিয়া মানবজন্ম লইয়াছিলেন তাই তাঁহার উদার আহ্বান যদিও তখন বদ্ধকর্ণ ভারতবাসীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আজ তাহা আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। ভারতবর্ষের লুপ্তপ্রায় ভিত্তিটিকে তিনি প্রথমে খনন করিয়া আবিষ্কার করেন এবং তাহার উপর উচ্চ প্রাসাদ প্রস্তুতের কল্পনা তাঁহার মানসপটে চিরকাল অঙ্কিত ছিল। আজ সেই ভিত্তির উপর যে সকল অট্টালিকাশ্রেণী

উঠিতেছে, তাহারা সকলেই সেই মূল ভিত্তির নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ। আমরা এখনো যদি তাহা বুঝিতে না পারি তবে ঝঞ্ঝাবাত বা ভূমিকম্পের দ্বারা অট্টালিকা কম্পিত হইবে তখন আমরা আর সেই ভিত্তিকারককে স্মরণ এবং পূজা না করিয়া থাকিতে পারিব না।

সহযোগিতা ও পরজীবিতা।

দুই পৃথক জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ জীবনরক্ষার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে, এ প্রকার ঘটনা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না। কিন্তু ইতর জীবের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ব্যাপারটিকে Symbiosis বলেন। ইহার বাংলা পরিভাষা ঠিক্ কি হওয়া উচিত, জানি না। সহযোগিতাই বলা যাউক।

খঞ্জ যখন বলবান্ অন্ধের স্কন্ধে চাপিয়া ভিক্ষার জন্য দাতার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে তখন বেশ একটা সহযোগিতা থাকে। অন্ধ পথ চলে, খঞ্জ তাহার ঘাড়ে বসিয়া পথ নির্দ্দেশ করে। তা'র পর ভিক্ষালব্ধ অর্থ দু'জনে সমান ভাগ করিয়া লয়। এই ব্যবস্থায় একের অসম্পূর্ণতা অপরে পূরণ করিয়া, শেষে দু'জনেই লাভবান্ হইয়া পড়ে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই ব্যাপারটিকে Symbiosis বা সহযোগিতা বলেন না। ভিন্ন জাতীয়-জীবের মধ্যে যে স্বাভাবিক আদানপ্রদান তাহাই সহযোগিতা। গরুটিকে ঘাসজল খাওয়াইয়া পুষ্ট করিলে, সে যখন দুগ্ধধারা দান করিয়া ঋণের ঋণ পরিশোধ করে, তখনো ইহাকে সহযোগিতা বলা যায় না। এই ব্যাপারে পূর্ণ মাত্রায় দোকানদারী বর্ত্তমান। ইহার আগাগোড়া কেবল মানুষের চতুরতাতেই পূর্ণ। পৃথিবীতে ঘাসজলের অভাব নাই। মানুষ যদি কৃত্রিম উপায়ে গো-জাতিকে পরাবলম্বী না করিত, তবে তাহারা কখনই গো-শালায় আশ্রয় গ্রহণ করিত না। প্রকৃতিদত্ত তৃণমুষ্টি আহার করিয়া এবং দুগ্ধধারায় নিজের সন্তানগুলিকে পুষ্ট করিয়া, বেশ নির্ব্বিবাদে দিন কাটাইত।

উদ্ভিদ ও মধুমক্ষিকার কার্য্যে সহযোগিতার একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়।

ফুলের পরাগগুলি গর্ভকেশরের (Pistils) উপরকার আঠালো অংশে আসিয়া লাগিলে, ফলের উৎপত্তি সুরু হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, একই ফুলের পরাগ যদি তাহারি গর্ভকেশরে আসিয়া লাগে, তবে ফল ভাল হয় না। এই প্রকারে ফল উৎপন্ন করিতে থাকিলে, চারি পাঁচ পুরুষের মধ্যে গাছের বিশেষ অবনতি দেখা যায়। এক গাছের ফুলের পরাগ যদি সেই জাতীয় অপর কোন গাছের গর্ভকেশরে গিয়া পড়ে, তবেই ফল ভাল হয়, এবং তাহারি বীজহইতে যে সকল গাছ হয়, সেগুলির পুষ্পপত্রে ফলে উন্নতির সকল লক্ষণগুলি প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাজেই বলিতে হয়, পরাগের আদান প্রদান ক্রমোন্নতির পথে চলিবার একটা প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় উদ্ভিদ্ মাত্রই হস্তপদহীন এবং একবারে চলচ্ছক্তিরহিত। মাটিহইতে উঠিয়া, দুইপদ দূরবর্ত্তী গাছের ফুলহইতে পরাগ আনিয়া যে নিজের ফুলে দিবে, এমন সামর্থ্য কোন উদ্ভিদেরই নাই। প্রকৃতির বিধানে মাটি হইতেই ইহারা

খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং মাটিতে মূল প্রোথিত করিয়া নিশ্চল থাকিলেই ইহাদের জীবনরক্ষা হয়।

মধু-মক্ষিকার প্রকৃতি উদ্ভিদের ঠিক্ বিপরীত। ইহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল। কাজেই জীবনরক্ষার জন্য ইহাদের অধিক খাদ্যের আবশ্যক হয়, এবং খাদ্যটুকুকে নিজেদেরই খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করিতে হয়। অচল উদ্ভিদ, তাহাদের পুষ্পগুলিতে সচল মক্ষিকার জন্য প্রচুর মধু সঞ্চিত রাখে। মক্ষিকা মধুর প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। সেই সযত্নসঞ্চিত মধু আকণ্ঠ পান করিয়া এবং পুষ্পের পরাগ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ইহারই অপর পুষ্পের গর্ভ-কেশরে তাহা লাগাইয়া আসে। এই ব্যবস্থায় মধুমক্ষিকা এবং উদ্ভিদ্ উভয়েরই উপকার হয়। মক্ষিকা মধুপান করিয়া তুষ্ট হয় এবং উদ্ভিদ মক্ষিকারই সাহায্যে পরাগের আদানপ্রদান করিয়া বংশের উন্নতিসাধন করিতে থাকে। প্রকৃতির নির্দ্দেশে জীবনের ধারাকে বিচিত্র পথে চালাইয়া দুইটি পৃথক জাতীয় জীব ঘটনাক্রমে মিলিত হইয়া যখন এইপ্রকার পরস্পরের উপকার করিতে থাকে, তখনি তাহারা সহযোগী হয়।

বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা এবং কাণ্ডাদিতে বর্ষার শেষে যে এক প্রকার সবুজ ও সাদায় মিশানো ছাতা (Lichens) দেখা যায়, তাহার জীবনের ইতিহাস খুঁজিলে, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় উদ্ভিদের সহযোগিতার অদ্ভুত কার্য্য ধরা পড়ে!

শৈবাল (Algae) এবং ব্যাঙের ছাতা (Fungi) উভয়েই উদ্ভিদ্শ্রেণীভুক্ত হইলেও জাতিতে উহারা সম্পূর্ণ পৃথক। শৈবাল উদ্ভিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাদের অনেকেরই দেহখানি এক-কোষময়। এই কোষটিকেই দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ইহারা বংশবিস্তার করে। অগভীর আবদ্ধ জলে যে সবুজ সর পড়ে, তাহা এই শ্রেণীরই কোটি কোটি উদ্ভিদের সমষ্টি। পুষ্করিণীর জলে সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় যে সকল উদ্ভিদকে ভাসিতে দেখা যায়, তাহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। তবে ইহারা অপরের তুলনায় কতকটা উন্নত। এই শৈবাল-গুলির জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, জীবনরক্ষার জন্য যেটুকু আকরিক পদার্থের আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ইহারা অপর উদ্ভিদের ন্যায় মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে মূল চালনা করে না। আর্দ্র স্থানই শৈবালের আবাস, এইসকল স্থানে জলের সহিত যে আকরিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাই উহাদের জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ঠ। মৃত্তিকার সহিত ইহাদের অতি অল্পই সম্বন্ধ থাকে। জীবনের কার্য্য চালাইতে গেলে যেসকল জৈব পদার্থের আবশ্যক, তাহা এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্গণ দেহের হরিৎ-কণার (Chlorophyll) সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া লয়।

ব্যাঙের ছাতা যে উদ্ভিদশ্রেণীভুক্ত তাহাও শৈবালের ন্যায় অপুষ্পক, কিন্তু মূলহীন নয়। উদ্ভিদমাত্রেই মূলদ্বারা আকরিক খাদ্য সংগ্রহ করে। উহারাও মূলের সাহায্যে হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন্, ফস্‌ফরস্, পটাসিয়ম্, ম্যাগ্নেসিয়ম্ প্রভৃতি পদার্থ দেহস্থ করিতে থাকে। কিন্তু দেহে হরিৎ-কণা না থাকায়, সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় ইঁহারা জৈব পদার্থ নিজে নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না। কাজেই যে সকল স্থলে পচা জৈব পদার্থ থাকে, তাহার উপরে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সেই পচা খাদ্য দেহস্থ করিয়া ইহারা জীবন কাটাইয়া দেয়। এই কারণেই

গলিত গোময়-গোমূত্রযুক্ত স্থান এবং পচা পাতা এবং ডালই ব্যাঙের ছাতার প্রধান জন্মক্ষেত্র। উদ্ভিদ্ মৃত্তিকায় যে সকল খাদ্য পায়, তাহা সকল সময় ঠিক খাদ্যের আকারে থাকে না। মূল হইতে এক প্রকার দ্রাবক (Acid) নির্গত করিয়া এবং তাহারি সাহায্যে কঠিনকে দ্রব করিয়া উহারা অখাদ্যকে খাদ্যে পরিণত করে। ব্যাঙের ছাতার যে সকল ছোট ছোট মূল আছে, সেগুলি হইতে ঐ দ্রাবক প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, কাজেই আকরিক খাদ্য সংগ্রহে ইহাদিগকে একটুও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

এখন মনে করা যাউক ব্যাঙের ছাতা এবং শৈবাল ঠিক্ পাশাপাশি থাকিয়া বৃক্ষত্বক্ বা শিলাখণ্ডের উপর আশ্রয় লই-য়াছে। বৃক্ষত্বকে জৈব বস্তু এবং আকরিক পদার্থ উভয়ই মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু কোনটিই উদ্ভিদের খাদ্যরূপে থাকে না। শিলাখণ্ডে আবার জৈব বস্তু একটুও মিলে না, ইহার আগাগোড়া কেবল আকরিক পদার্থ দিয়াই গঠিত। এই অবস্থায় ব্যাঙের ছাতা ও শৈবাল পৃথক জাতীয় উদ্ভিদ হই-য়াও, পরম সখ্যতায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। দেহের হরিৎ-কণার সাহায্যে বায়ুর অঙ্গা-রক-বাষ্প (Carbonic Acid Gas) টানিয়া শৈবাল যে জৈব বস্তু প্রস্তুত করে, তাহার সমস্তটা গ্রাস না করিয়া সে একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতাকে দিতে থাকে। ব্যাঙের ছাতা এই দানের কথা ভুলে না। সে যখন মূল-নিঃসৃত দ্রাবকের সাহায্যে বৃক্ষত্বক্ বা শিলার আকরিক পদার্থগুলিকে খাদ্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রস্তুত খাদ্যের একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতার জন্য রাখিয়া দেয়। এই ব্যবস্থায় কাহারো খাদ্যের অভাব হয় না। উভয় উদ্ভিদই পরিতুষ্ট হইয়া বংশবিস্তার দ্বারা একএকটি ছোটখাটো উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। বৃক্ষত্বক্ শিলাখণ্ড বা পুরা-তন প্রাচীরের গায়ে যে সাদা ও সবুজে মিশানো ছাতা দেখা যায়, তাহা শৈবাল এবং ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যাঙের ছাতারই উপনি-বেশ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরস্পরের সাহায্য করিয়াই উহারা জীবিত থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহই একা বৃক্ষত্বক বা শিলাখণ্ডের ন্যায় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না।

মটর, কড়াই, সিম প্রভৃতি সিম্বীপ্রদ (Leguminous) উদ্ভিদের জীবনের ইতিহাসেও সহযোগিতার কার্য্য দেখা যায়। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে জন্মিলে এই সকল উদ্ভিদ নাইট্রো-জেনের অভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় এক প্রকার জীবাণু (Bacillus) উহাদের মূলে বাসা বাঁধিয়া নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করিতে থাকে। বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা এই জীবাণু গুলিতে দেখা যায়। উদ্ভিদগুলিও তাহাদের মূলাশ্রিত অতিথি সম্প্রদায়ের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে ভুলে না। অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত অনেক সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া জীবাণুগুলিকে খাওয়াইতে আরম্ভ করে। এই আদান-প্রদানে উদ্ভিদ্ ও জীবাণু উভয়েই পরম লাভবান্ হয়।

মনুষ্যসমাজে যেমন দস্যু তস্কর আছে, উদ্ভিদ-রাজ্যেও সে প্রকার নির্ম্মম জীব যথেষ্ট দেখা যায়। সদুপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেহ প্রাণ একত্র রাখার অভ্যাস ইহাদের মোটেই নাই। পরের ঘাড়ে চাপিয়া এবং আশ্রয়দাতার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া উদরপূর্ত্তি করাই ইহাদের কাজ। পরজীবী উদ্ভিদ অর্থাৎ পরগাছা (Parasite)

এই দস্যুসম্প্রদায়ভুক্ত। সুস্থ গাছের উপর জন্মিয়া নিজেদের মূলের সাহায্যে এগুলি এমন নির্ম্মম ভাবে আশ্রয়দাতার রস শোষণ করিতে থাকে, যে অল্প দিনের মধ্যেই তাহার জীবনান্ত ঘটে। পরজীবী উদ্ভিদের বীজাদি মৃত্তিকায় বপন করিলে অঙ্কুরিত হয় না। মৃত্তিকা হইতে খাদ্য সংগ্রহের শক্তি হইতে ইহারা একবারে বঞ্চিত। পরজীবী উদ্ভিদের ন্যায় পরজীবী প্রাণীরও অস্তিত্ব আছে। প্রাণীর অন্ত্রে (Intestine) যে সকল কৃমি জন্মায় তাহারা সম্পূর্ণ পরজীবী। দেহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং ভুক্ত খাদ্যে ভাগ বসাইয়া ইহারা প্রাণ ধারণ করে। দদ্রু-উৎপাদক জীব, উকুন এবং এঁটোলি প্রভৃতিকেও এই দলে ফেলা যাইতে পারে। ইহারা সকলেই আশ্রয়দাতার শোণিত শোষণ করিয়া জীবনরক্ষা করে। কিন্তু কেহই এই উপকারটুকুর বিনিময়ে আশ্রয়দাতাকে কিছুই দান করে না বরং নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি করিয়া উপকারীর জীবনান্তের চেষ্টা দেখে।

আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ গুলিকে কোনক্রমে সহযোগিতা বলা যায় না বরং উহাতে কতকটা প্রতিযোগিতার ভাবই বর্ত্তমান। কিন্তু প্রাণীর অন্ত্রে যে সকল জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আশ্রয়দাতার সহিত সহযোগিতা করে বলিয়া আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করিতেছেন। ইহারা উদরস্থ অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত খাদ্য গুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, অঙ্গারক বাষ্প এবং মিথেন্ (Methane) প্রভৃতি বায়ু উৎপন্ন করিতে থাকে। বলা বাহুল্য ইহাতে আশ্রয়দাতার কোনই উপকার হয় না, বরং পেট-ফাঁপা ইত্যাদি পীড়া দেখা দেয়। কিন্তু ইহারি সঙ্গে জীবাণুগুলি আমোনিয়া (Ammonia) প্রভৃতির দ্বারা পাকযন্ত্রে আলবুমেন্ ইত্যাদি যে পরম পুষ্টিকর পদার্থের গঠন করে, তাহাতে আশ্রয়দাতার অশেষ উপকার হয়।

মনুষ্যসমাজে খাঁটি সহযোগিতা (Symbiosis) বা খাঁটি পরজীবিতা (Parasitism) কোনটারই উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, যাহাকে সহযোগিতা বলিব, কি পরজীবিতা বলিব, স্থির করা দায় হয়। ইউরোপের সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায়, ধনী মহাজন কণ্ট্রাক্টর ও বড় বড় কলকারখানার চালকদিগকে পরজীবী আখ্যা দিয়া থাকেন। সঙ্কটের সময় এই লোক গুলিই কি প্রকারে ক্ষুধার্ত্তের শূন্য উদর পূর্ণ করে, তাহা সোসিয়ালিষ্টগণ ভুলিয়া যান। আবার যখন ধনী এবং মহাজনগণ অর্থ-সঞ্চয়ের আকাঙ্খায় নিজেদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া দরিদ্রসমাজের ভাতজল বন্ধ করেন তখন তাঁহাদের পরজীবী-মূর্ত্তিখানিই প্রকাশ পায়।

স্তন্যপায়ী মানব-শিশুকে এবং ইতর প্রাণীর নিঃসহায় শাবকগুলিকে অনেকে পরজীবী প্রাণীর দলে ফেলিতে চাহেন। খাঁটি প্রাণীতত্ত্বের দিক দিয়া লাভ ক্ষতির হিসাব করিতে বসিলে, ইতর স্তন্যপায়ীদিগের সন্তানগুলিতে পরজীবীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু যাঁহারা মানবশিশুকে পরজীবী বলিতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তি তর্কের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। জীবতত্ত্বের মানদণ্ড দিয়া মানবের সুখদুঃখ আনন্দকে কখনই মাপা চলে না। জননী যখন হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহাই বোধ হয় সেই দুগ্ধধারার ঋণ পরিশোধ করে। এই আনন্দ মানুষের

মনগড়া কৃত্রিম আনন্দ নয়। যে আনন্দের সাগরে বিশ্বনাথ এই ব্রহ্মাণ্ডটিকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, পুত্রের স্বাস্থ্যে জননীর আনন্দ তাহারি অংশ। ইহা সহজ সংস্কারজাত অতি পবিত্র আনন্দ। বাহিরের বৈরিতার অন্তরালে তলায় তলায় প্রাণীতে উদ্ভিদে, জড়ে ও জীবে যে চিরন্তন সখ্যতা আছে, মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধকে সেই সখ্যতাই সরস করিয়া রাখিয়াছে। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে মাতা ও সন্তানে, যে সে সম্বন্ধ নাই, তাহা কেহই বলিতে পারেন না; বরং থাকারই সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, আমরা শিশুকে কখনই পরজীবী বলিতে পারিব না।

সহযোগিতা ও পরজীবিতার পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি আলোচনা করিয়া আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ একটা বৃহৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইঁহারা বলিতেছেন, উচ্চশ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহগুলি কোটি কোটি সহযোগী কোষেরই এক একটা বৃহৎ উপনিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পৃথক গুণসম্পন্ন কোষগুলি বহুকাল সহযোগিতা করিয়া এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে এখন একের অভাবে অপরগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে না। বহুকালের সহযোগিতার এই প্রকার সম্বন্ধ অপর জীবের মধ্যেও দেখা যায়। যে সকল পিপীলিকা আপ্‌হাইড্‌ নামক কীট (পিপীলিকা-ধেনু) পালন করিয়া কীটদেহ নিঃসৃত রসপানে জীবন ধারণ করে, দীর্ঘ সহযোগিতায় তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা এপ্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে এখন উহারা আপ্‌হাইড্‌ কীটের সাহায্য ব্যতীত বাঁচে না এবং কীটগুলিও পিপীলিকার যত্ন ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং জীবদেহকে যদি কতকগুলি সহযোগী কোষের সমষ্টি বলা যায়, তবে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। জীবনের অনেক কার্য্যে আজ কাল সহযোগিতার যে সকল পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে পোষণই করিতেছে। রক্তের শ্বেত-কণিকাগুলির (White Corpuscles) কার্য্য প্রাচীন শরীরবিদ্‌গণ জানিতেন না। এখন দেখা গিয়াছে, অনিষ্টকর জীবাণু রক্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেই, ঐ শ্বেত-কণিকাগুলিই সেগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তা'ছাড়া পিপ্‌টন্ (Peptones) হইতে আলবুমেনয়ডের (Albumenoids) উদ্ধার এবং ক্ষত স্থানের আরোগ্যবিধান প্রভৃতি আরো অনেক কাজে শ্বেত-কণিকার সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

প্রার্থনা।

আজিকার এই দিনে জীবনে আমার,
তোমার অমৃতধারা যেন অনিবার
লভি প্রাণে, তব পুণ্য মঙ্গল পরশ
করে দেয় মন প্রাণ সজীব সরস।
প্রতি কার্য্যে তোমারেই পাই দেখিবারে,
তোমারি মধুর নাম হৃদয়ে ঝঙ্কারে।
এত ক্ষুদ্র এত দীন ক্ষুদ্র তৃণ আমি
তবু দয়া তব এত, ওগো অন্তর্যামী।
সুধাধারা সম বর্ষি হৃদয়ে আমার
তোমারি করিয়া নেছ, কি জানাব আর
মনোভাব ভাষা মাঝে দিব প্রকাশিয়া
হেন শক্তি নাই মম, ক্ষুদ্র দীন হিয়া
লুটায় প্রণত হয়ে ও-চরণ পরে
হৃদয় ভরিয়া উঠে কৃতজ্ঞতা ভরে।

প্রার্থনা।

(১)

তোমার পূজার তরে পবিত্র করিয়া
লও জগদীশ তুমি এই ক্ষুদ্র হিয়া।
সংসারের প্রলোভন পাপের মাঝার,
এখনো হয়নি ম্লান বাসনা আমার।